জুল ভর্ণ ফরাসী দেশের অন্তর্গত নান্টে নামক স্থানের অদূরে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

পিতার ইচ্ছানুসারে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তিনি প্যারী নগরে আইন অধ্যয়ন করতে আসেন। কিন্তু আইন পড়ার চেয়ে লেখার দিকেই তাঁর ঝোঁক যায় বেশী।

এর কিছুকাল পর থেকেই তাঁর পরমাশ্চর্য্য সব উপন্যাস বের হতে আরম্ভ করে। প্রথম বই 'ফাইভ উইক্স্ ইন্ এ বেলুন' বের হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিখ্যাত হয়ে যান। অথচ মজার কথা এই যে, পর পর পনেরজন প্রকাশক এই বই নিতে অস্বীকার করে। তখন বিরক্ত হয়ে জুল ভর্ণ এর পাণ্ডুলিপি আগুনে নিক্ষেপ করেন। ভাগ্যিস তাঁর স্ত্রী এটিকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন নয়ত এমন একখানা সুন্দর উপন্যাস থেকে পৃথিবী বঞ্চিত হত।

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে তাঁর উপন্যাস পড়ে লোকের নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে তিনি বোধ করি বহুবারই সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু আসলে, একবার মাত্র জাহাজে করে ইংলিশ চ্যানেল? পেরিয়ে স্কটল্যাণ্ড? গিয়েছিলেন, তাছাড়া সারাজীবনে আর কখনো তিনি দেশের বাইরে পদার্পণ করেননি। একটানা চল্লিশ বছর ধরে একই ঘরে বসে বছরে দুখানা করে অপরূপ উপন্যাস রচনা করে গেছেন। কেবল মাত্র গভীর পড়াশোনা ও মানচিত্রের সাহায্যে যে বিভিন্ন দেশের বাস্তবানুগ এমন নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব তা এর আগে কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

আজ আমরা বাস্তবে যে সব আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তার অনেক কিছুই জুল ভর্ণ অর্দ্ধশতাব্দীরও পূর্ব্বে কল্পনায় লিখে গিয়েছিলেন। বস্তুত, টেলিভিসান, হেলিকেপ্টর, সাবমেরিন, এরোপ্লেন, নিয়ন আলো, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি বিষয় তিনিই প্রথম কল্পনা করেন। সৌভাগ্যের কথা যে জীবিতকালেই তিনি তার কল্পনার অনেক কিছুকেই বাস্তবে রূপান্তরিত হতে দেখে গেছেন।

## ॥ আমাদের ছোটদের নতুন বই ॥

মনোজ বসু

রাজার ঘড়ি ৩·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ৩·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চার মূর্তির অভিযান ৪·০০

পটলডাঙার টেনিদা ৪·০০

টেনিদা দি গ্রেট ৪·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের রচনা ৭·০০

অজিত চট্টোপাধ্যায়

নীল দরিয়ায় ৬·০০

সাগরময় ঘোষ

দণ্ডকারণ্যের বাঘ ৩·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কিশোর সঞ্চয়ন ৬·০০

আশা দেবী

টেনিদার পিসতুতো ভাই মুসুরী ৩·০০

ইন্দ্র চক্রবর্তী

সুন্দরবনের মানুষখেকো বাঘ ৪·০০

জুল ভর্ণ

উইলহেম স্টোরিজের গুপ্তরহস্য ৬·০০

## ॥ এক ॥

ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্টকে যাঁরা খুঁজতে এসেছিলেন তাদের হতাশা বুঝি এই মুহূর্তে চরমে পৌঁছল। নতুন এবং অজানা এই দেশে খোঁজাখুঁজি কোথায় করবেন তাঁরা? 'ডানকান' জাহাজ হাতছাড়া হয়ে গেছে। এমন কি অচিরে স্বদেশ স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যাবার সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত।

এইভাবে একজন উদার ও সহৃদয় স্কটল্যাণ্ডবাসী ভদ্রলোকের যথার্থ একটি সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজ বিফলতায় পর্যবসিত হতে চলল।

[illegible] কাজ। অকৃতকার্য হলেন লর্ড গ্লেনারভ্যান। উপায় [illegible] হয়ে তাকে নির্ধাবিত অনুসন্ধানকার্য [illegible] নিরুপায়—।

[illegible] হল নিরুদ্দিষ্ট ক্যাপ্টেনের মেয়ে মেরি [illegible] সে এতটুকু প্রতিবাদ করল না। নিজের মনোযন্ত্রণা সে আর পাঁচজনের মুখ চেয়ে মনের মধ্যেই চেপে রাখল। বাইরে প্রকাশ করল না। বরং সর্বাগ্রে সে-ই স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যাবার প্রস্তাব করল।

তরুণ যুবক জন ম্যাঙ্গলস্ মেরির মনোভাব দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। আরও কিছুকাল ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্টের জন্য অনুসন্ধানকার্য চালাবার প্রস্তাব করতে মেরিই বাধা দিল, বললে, তা হয় না। আজ এ ব্যাপারে যাঁরা সর্বস্বান্ত হলেন, তাঁদের কথাটা আমাদের আগে চিন্তা করা উচিত। লর্ড গ্লেনার ভ্যানের এখন ইয়োরোপে অবশ্যই ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।

জন ম্যাঙ্গলস্ মাথা নাড়ে সম্মতিতে, বলে ঠিকই বলেছ তুমি।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে 'ডানকান' জাহাজের করুণ পরিণতির সংবাদটি জানানো প্রয়োজন। তবে,—নিরুদ্দিষ্ট পিতার জন্য মনোকষ্টে বিষণ্ণ মেরির মুখপানে চেয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে জন বলে যায়, তুমি হতাশ হয়ো না মেরি। তোমরা দেশে ফিরে যাও। আমি যাব না। আমি এখানে থেকে একাই ক্যাপ্টেনের অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যাব। ক্যাপ্টেনকে আমি খুঁজে বার করব নয়ত সে কার্যে আত্মদান করব, এই আম-সংকল্প।

শুনে দৃশ্যতই মুগ্ধ হল মেরি। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছল ছল করে উঠল।

এখন এক চিন্তা, ফিরে চল আপন ঘরে। এখান থেকে মেলবোর্ন মেলবোর্ন থেকে—-

## ॥ দুই ॥

কাহিনীর শুরু সেই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্ট 'ব্রিটেনিয়া' জাহাজ নিয়ে ইংলণ্ডের গ্ল্যাসগো বন্দর ত্যাগ করে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে রওনা দেন।

স্কটল্যাণ্ডবাসী ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্ট জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে যান।

তাব উদ্দেশ্য ছিল সেখানে কোন নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করে স্বদেশের কোন উপনিবেশ স্থাপন করা!

সংবাদে প্রকাশ:

তিনি অস্ট্রেলিয়াব উপকূল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে ছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।

ব্রিটেনিয়া জাহাজ সুদ্ধ, তিনি বেমালুম নিখোঁজ হয়ে যান। বেপাত্তা হয়ে যান।

এ ঘটনার পব পুরো তু'বছর কেটে গেল।

অবশেষে ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্টের জন্য চব্বিশ মাস অপেক্ষা করবার পরও তিনি ফিবে এলেন না দেখে লর্ড গ্লেনার ভ্যান নামে অপর একজন উদারচেতা ভদ্রলোক 'ডানকান' নামক একটি জাহাজ নিয়ে উক্ত ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্টের সন্ধানে অস্ট্রেলিয়ার দিকে আসেন।

সেই জাহাজে তাঁর সঙ্গী হয়ে আসে তাঁর স্ত্রী লেডি হেলেনা, ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্টের কন্যা মেরি আর ছেলে রবার্ট। জন ম্যাঙ্গলস্ নামে এক তুঃসাহসিক তরুণ যুবক (সে জাহাজ পরিচালনা করিতেও জানে)। প্যাগানেল নামে জনৈক ভৌগোলিক। একজন মেজর, পাচক অল্‌বিনেট, মিঃ মুলরাডি, মিঃ উইলসন এবং আরও বহু লোক।

তিনি সদলবলে একদা এসে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেন।

কিন্তু হায়! সেখানে পৌঁছে তাঁদের উপর নেমে আসে বিপত্তির একের পর এক ঢেউ। পর পর বহু বিপদের সম্মুখীন হন তাঁরা।

প্রথম পড়েন এক ঠগের পাল্লায়।

ফলে, একমাত্র সম্বল সবেধন নীলমণি জাহাজ 'ডানকান'-কে চিরতরে হারাতে হয়।

সে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি হল নিম্নরূপ :

লর্ড গ্লেনারভ্যান সদলবলে জাহাজ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে টু-ফোল্ড উপসাগরের একস্থানে এসে অবতরণ করেন।

সেখানে নেমে এক ফার্মে ওঠেন।

সেই ফার্মে অকস্মাৎ এমন একজন মানুষের সঙ্গে লর্ডের সাক্ষাৎ হয়ে যায়, যাকে পেয়ে তিনি প্রকৃতই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

লোকটির নাম আইরটন।

সে ছিল নিরুদ্দিষ্ট ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্টের নিরুদ্দিষ্ট জাহাজ ব্রিটেনিয়ার কোয়ার্টাব মাস্টার।

এ রকম একটা লোকের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটাকে একটা সৌভাগ্যজনক ঘটনা বলেই মনে করলেন লর্ড গ্লেনার ভ্যান।

যাক্—এবার তাহলে ক্যাপ্টেনের খোঁজ পেতে আর অসুবিধে হবে না।

প্রত্যেকের মনেই আশার আলো সঞ্চারিত হল।

কোয়ার্টার মাস্টার 'আইরটনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে লর্ড জানতে পারলেন যে ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্টের জাহাজ ব্রিটেনিয়া খুব সম্ভব ডুবেই গেছে!

ডুবে গেছে? কোথায়? কি ভাবে?

ক্যাপ্টেন কোথায়? জাহাজের আর আর নাবিকেরাই বা কই?

এর কোন সদুত্তর পাওয়া গেল না।

ক্যাপ্টেন বা নাবিকদল কে কোথায় আছে বা আদৌ জীবিত আছে কি না একথা নাকি আইরটন সঠিক করে বলতে পারে না।

কেবলমাত্র নিজে সে নাকি কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে এখানে এসে উঠেছে।

স্তম্ভিত হতাশায় লর্ড গ্লেনার ভ্যান ও তাঁর দলের লোকজন আইরটনের এইসব কথাবার্তা শুনে গেল। কথাগুলো কেমন যেন এলোমেলো।

অতঃপর এক সময় আইরটন প্রস্তাব করে ব্রিটেনিয়া জাহাজ-ডুবির সম্ভাব্য স্থানটি ওদের দেখাবে বলে।

—চলুন লর্ড যেখানে জাহাজটা মনে হয় ডুবে গেছে সেখানে আপনাদের নিয়ে যাই।

লর্ড দলের কয়েকজন সহ আইরটনের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন।

যেতে হবে স্থল পথে।

'ডানকান' রইল ওখানে। ওঁরা রওনা হলেন বনপথে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে।

একটি ঘোড়ার গাড়ি করে লর্ড জঙ্গলাকীর্ণ পথ দিয়ে সেই সম্ভাব্য স্থানের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বহুদূর যাবার পর এক কাণ্ড হল।

সেই গভীর জঙ্গলের মাঝখানে রহস্যজনক ভাবে ঘোড়াগুলোর অকস্মাৎ মৃত্যু হল।

কি ভয়াবহ অবস্থা। গাড়ি অচল।

জনমানব বর্জিত জঙ্গল।

মহাবিপদে পড়লেন সবাই।

জাহাজ থেকে বহু দূরের পথ এসে পড়েছেন। এতটা পথ হেঁটে ফেরাও তো অসম্ভব। এখন উপায়?

উপায় বাত্‌লালো স্বয়ং আইরটনই।

সে বললে, লর্ড একটা উপায় আছে।

—কি উপায় ?

—উপায় হল, আপনি আপনার ডানকান জাহাজের সহকারী ক্যাপ্টেনকে একটা চিঠি লিখে নির্দেশ দিন, সে যেন সমুদ্র দিয়ে জাহাজ চালিয়ে উপকূল বরাবর এদিকে এগিয়ে আসতে থাকে। সেই চিঠি নিয়ে আমি চলে যাই। এদিকে আপনারা পূব দিক বরাবর হাঁটতে থাকুন। পূব দিকে কিছুদূর গেলেই সমুদ্র পাবেন। সেখানে আপনারা অপেক্ষা করবেন। এদিকে আমি চিঠি নিয়ে গিয়ে 'ডানকান' জাহাজকে ঐ উপকূলে নিয়ে আসব। তখন আপনারা জাহাজে উঠবেন।

—বেশ তাই হোক।

লর্ড গ্লেনারভ্যান আইরটনের কথা মত জাহাজের সহকারীকে একটি পত্র লিখে ওরই হাতে সে পত্র দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিলেন।

অতঃপর নিজেরা চললেন পূর্ব দিকে। সমুদ্রের উদ্দেশ্যে।

আইরটন পদব্রজে রওনা হয়ে গেল পত্র নিয়ে।

## ॥ তিন ॥

কিন্তু হায়, সে যেন অগস্ত্য-যাত্রা হল। সেই তার শেষ যাওয়া।

আর সে ফিরে এল না।

না সে এলো, না এলো জাহাজ 'ডানকান', অভূতপূর্ব পরিস্থিতি।

লর্ড গ্লেনারভ্যান তাঁর সঙ্গীদল সহ বেশ কয়দিন অপেক্ষা করলেন সমুদ্রতীরে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

অপেক্ষা করাই সার হল।

সমুদ্রের কোথাও তাঁদের জাহাজের টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না।

একি অবিশ্বাস্য ঘটনা! তাঁর পত্র পেয়ে ও সহকারী ক্যাপ্টেন এদিকে এল না কেন? না, কি পত্র পায় নি? আইরটন শেষ পর্যন্ত পৌঁচেছে তো? একটা অদ্ভুত রহস্যজনক ঘটনা ঘটলো তো।

অতঃপর স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে যে কাহিনী শোনা গেল তা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি ভয়ংকর।

লর্ড গ্লেনারভ্যানকে স্থানীয় অধিবাসীরা বললে, যে একদল কয়েদী নাকি পাথ-এর জেলখানা থেকে পালিয়ে এসে এ অঞ্চলে ক্রমাগত দস্যুগিরি করে বেড়াচ্ছে।

ভয়ানক হিংস্র প্রকৃতির মানুষ সেই ডাকাত দল।

বিচিত্র সব ছদ্মবেশে নাকি ঐ দলের লোকেরা এখানে সেখানে যত্রতত্র ঘোরাফেরা করে থাকে।

তারা খুনখারাপী, লুঠতরাজ ও নিষ্ঠুর অত্যাচার নিপীড়নে এ অঞ্চলের মানুষদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

—তাহলে কি—?

—হ্যাঁ তাই বটে, লর্ড গ্লেনারভ্যানের ও তাঁর সঙ্গীদলের দুরবস্থার কথা শুনে স্থানীয় অধিবাসীরা জোরের সঙ্গেই বলে, এই কাজ অবশ্যই ঐ ডাকাতদলের। ওদের অসাধ্যকর্ম কিছু নেই।

ঐ জেল ভেঙে ফেরার কয়েদী দস্যুগণই আপনাদের 'ডানকান' জাহাজকে মিথ্যা ছলের দ্বারা নিজেদের কবলিত করে ফেলেছে এবং যথারীতি সেটি নিয়ে সরে পড়েছে।

এতকাল বেটারা ছিল স্থলদস্যু, স্থানীয় অধিবাসীরা মন্তব্য করে, এবার ওরা হল জলদস্যু।

তারা আরও জানায় যে, যে লোকটা লর্ডের কাছে আইরটন পরিচয়ে এসেছিল, সে উক্ত কয়েদী দস্যুদলের সর্দার বেন জয়েস ছাড়া আর কেউ নয়।

কয়েদী ডাকাত দলের কুখ্যাতি সর্দার হল বেন জয়েস।

বলে কি। কী সর্বনাশ!

লর্ড ও তাঁর সঙ্গীদলের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল এবং আশংকা ও ভীতিতে কপালে বলীরেখা দেখা দিল।

হতবাক হয়ে গেল সবাই।

মাথায় হাত দিয়ে বসলো সকলে।

কী ভয়ংকর দুর্ভাগ্য! কি দুঃসময়। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস।

লর্ড গ্লেনারভ্যান স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে একটি মহৎ কার্য করতে এসেছিলেন, অর্থাৎ নিরুদ্দিষ্ট ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্টের খোঁজ করতে এসেছিলেন। একটি মহৎ কাজ নিয়েই রওনা হয়েছিলেন।

কিন্তু হায়, ক্যাপ্টেনের পাত্তা পাওয়া তো চুলোয় যাক, উপরন্তু নিজেদের একমাত্র বাহন 'ডানকান' জাহাজটিকে পর্যন্ত দস্যু হস্তে তুলে দিয়ে পরম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়তে হল সকলকে।

হা হতোস্মি। হা ঈশ্বর!

লর্ড গ্লেনার ভ্যানের বুক চেরা এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

সহৃদয় সজ্জন-মানুষ তিনি।

'ডানকানে'র অন্যান্য নাবিক বেচারাদের পরিণতি কি হয়েছে তা-ও অজ্ঞাত রয়ে গেল।

না কি ঐ নিষ্ঠুর ও হিংস্র দস্যুদল নাবিকদের হত্যা করে সমুদ্র জলে ফেলে দিয়েছে ?

সর্বাঙ্গে শিউরে উঠলেন লর্ড গ্লেনার ভ্যান একথা ভাবতে গিয়ে।

তাঁর মনটি বড় কোমল। বেদনায় অন্তরটি মোচড় দিতে লাগলো। চোখে এসে গেল অশ্রুজল।

কী নিদারুণ অবস্থার মধ্যেই না পড়েছেন তাঁরা !

আর কাজ বাকি রইল কি ? সবই বিফল হল। যে কাজ করতে এতদূর সাতসমুদ্র পাড়ি জমিয়ে এসেছিলেন তা সবই নিষ্ফল হয়ে গেল !

এবার ফিরে চল আপন ঘরে।

অর্থাৎ দেশের মানুষ দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফিরে যাওয়া ছাড়া করবারই বা কি আছে।

কি পরিতাপ, কি অনুশোচনা।

আরব্ধ কর্ম তো হলই না, উপরন্তু নিঃসম্বল, প্রায় নিঃসহায় ও বিফলকাম পরাজিত হয়ে অধোমুখে নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে।

ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্টের মেয়ে মেরি ও ছেলে রবার্ট বড় আশা নিয়ে এসেছিল এতদূর পথ। কিন্তু তাদের আদরের পিতাকে তো উদ্ধার করা গেলই না, এমন কি তাঁর কোন সংবাদাদির চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

নিরবে অব্যক্তে কাঁদতে লাগলো দুই ভ্রাতা ভগ্নি।

অবশেষে বুদ্ধিমতী মেয়ে মেরি, দলের প্রত্যেকের দুরবস্থা দেখে নিজ মুখেই স্বদেশে ফিরে যাবার প্রস্তাব করে।

জনম্যাঙ্গলস বলে সে নাকি একা এদেশে থেকে ক্যাপ্টেনের অনুসন্ধান চালিয়ে যাবে।

শুনে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মেরি।

দেশে ফিরতে হলে এখান থেকে মেলবোর্ন যেতে হয়, মেলবোর্ন থেকে ইয়োরোপগামী কোন জাহাজ ধরতে হবে।

কিন্তু দেশে ফিরে যাবার ব্যাপারেও এক মুস্কিল দেখা দিল।

যাবে যে জাহাজ কই।

টু-দোণ্ড উপসাগরে এমন কোন জাহাজ নেই যা ইয়োরোপে যাতায়াত করে।

ইয়োরোপগামী জাহাজ ধরতে হলে এঁদের যেতে হবে এক হয় মেলবোর্ন অথবা সিডনী বন্দরে। বহুদূরের রাস্তা।

কিন্তু দেখা গেল ঐ দুই বন্দরে যাবার মতও কোন জাহাজ বর্তমানে টু-দোণ্ড উপসাগরে নেই।

এমনই একটি জঘন্য ও বাজে বন্দর এটি।

যা দু-তিনখানা জাহাজ নোঙর করা রয়েছে তাও কাছাকাছি অপরাপর দিকের মালবাহী জাহাজ।

তা হোক। একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেই বা চলবে কি করে। খুঁজে দেখতে হবে।

অবশেষে সুফল ফললো।

খুঁজে খুঁজে একটি জাহাজ পাওয়া গেল নাম তার 'ম্যাকোযারি'।

এ জাহাজ যাবে নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর দ্বীপের রাজধানী অকল্যাণ্ড বন্দরে।

যাক, তাহলে সুরাহা হল।

## ॥ চার ॥

অকল্যাণ্ডে গেলেও ইয়োরোপগামী অনেক জাহাজই পাওয়া যাবে।

অতএব ওরা সবাই গিয়ে উপস্থিত হল সেই জাহাজে। এর শরণাপন্ন ছাড়া উপায় নেই বর্তমানে।

বরাতক্রমে উক্ত জাহাজের ক্যাপ্টেনটিও জুটলো তেমনি। লোকটি অতীব ত্যাঁদোড় !

নাম উইল হ্যালে।

লোকটার যেমন আকৃতি বদখদ তেমনি প্রকৃতি ব্যবহারও জঘন্য।

চোখ ছুটো জবাফুলের মত টকটকে লাল।

সব সময়েই নেশা ভাঙ করে থাকে বলে মনে হল।

ওদের জাহাজে আসতে দেখে কর্কশ কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল জাহাজের সেই ক্যাপ্টেন উইল হ্যালে, কি চাই শুনি ?

—আমরা ক্যাপ্টেনকে চাই, জনম্যাঙ্গলস বললে।

—আমিই ক্যাপ্টেন, কঠিন গলায় বললে উইল হ্যালে, কেন ?

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি আপনার এই জাহাজ তো অকল্যাণ্ড যাবে, তাই না ?

—হ্যাঁ তাই। তাতে হয়েছে কি ?

—এ জাহাজ কি বহন করে ?

—কেনা-বেচা চলে এমন যাবতীয় বস্তুই বহন করে।

—কবে এ জাহাজ ছাড়বে

—আগামী কাল জোয়ারের সময়। ঠিক ছুপুর বারোটা। কিন্তু কেন ?

—কয়েকজন যাত্রী নিতে পারবেন কি ?

সেটা নির্ভর করে কি ধরণের যাত্রী তার উপর আর নির্ভর করে আমাদের জাহাজী খাওয়া তাদের সহ্য হওয়ার উপর।

—খাদ্যদ্রব্য তারা নিজেরাই সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

—কজন লোক? দাঁতে দাঁত চিবিয়ে জানতে চায় উইল হ্যালে।

—নজন তার মধ্যে দুজন মহিলা।

—তাই বুঝি?

—আপনি যাত্রী নিতে তাহলে রাজি আছেন কি? জনম্যাঙ্গলস ওর অভদ্র ও কর্কশ ব্যবহার গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে জিগ্যেস করে।

—কত খরচা করবেন?

—কত চান আপনি? জনম্যাঙ্গলস জানতে চায়।

—পঞ্চাশ পাউণ্ড!

লর্ড গ্লেনারভ্যান মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে জন বলে, বেশ তাতেই রাজি।

উইল হ্যালে তার বিদঘুটে হাত বাড়িয়ে বলে—বেশ। আমায় আগাম দিতে হবে।

জনম্যাঙ্গলস গুনে গুনে পঁচিশ পাউণ্ড দিয়ে বললে—এই নিন পঁচিশ পাউণ্ড।

উইল হ্যালে তার দৈত্যের থাবার মত হাতে সে অর্থ নিয়ে নিজ পকেটে তা রেখে দিল। একটা ধন্যবাদ দেবার মত ভদ্রতাও দেখালো না।

শুধু কর্কশ কণ্ঠে জানালো, কাল সকালে এসে সুর সুর করে জাহাজে উঠে পড়বেন। কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় জাহাজ ছেড়ে দেব! কেউ, উঠুক আর না উঠুক, সেদিকে নজর দেব না, এক মিনিট ও দেরী করা হবে না বলে দিলাম।

—ঠিক আছে। তাই হবে।

বলে লর্ড গ্লেনারভ্যান, মেজর, রবার্ট, প্যাগানেল আর জনম্যাঙ্গলস নেমে এল জাহাজ থেকে।

—কি অমানুষ দেখেছেন? জন বলে।

—জানোয়ার, একটি ভাল্লুক বিশেষ, মেজর যোগ করে।

আমার ধ্রুব বিশ্বাস হচ্ছে যে, জনম্যাঙ্গলস বলে, এই ভাল্লুক ধরনের লোকটা অবশ্যই কোননা কোন সময়ে মানুষ-কেনা-বেচার কারবারে লিপ্ত ছিল।

—মরুকগে, লর্ড গ্লেনারভ্যান বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য হল অকল্যাণ্ডে পৌঁছনো। যেহেতু ওর জাহাজ সেখানে যাচ্ছে বাধ্য হয়ে কটা দিন এক সঙ্গে কাটাব। আর তো এজন্মে সাক্ষাৎকার হবে না।

যাবার তোড় জোড় লেগে গেল। অবশিষ্ট জিনিস পত্তর গুছিয়ে নিতে হবে।

মেজর মেলবোর্নের ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ওপর দেওয়া লর্ড গ্লেনারভ্যানের কিছু চেক ভাঙিয়ে ক্যাশ করে নিলেন।

ভৌগোলিক প্যাগানেল তার চিরকেলে অভ্যেস মত নিউজিল্যাণ্ডের একটি ভাল দেখে মানচিত্র কিনে নিল।

পরদিন ভোরবেলাই সবাই এসে পুনরায় ম্যাকোয়ারি জাহাজে উঠে পড়ল।

জাহাজের অধ্যক্ষ উইল হ্যালের চরিত্র বোঝা গেছে।

অতএব এই যাত্রীদলের খুব সাবধানে এবং সতর্ক হয়ে চলতে হবে ওর সঙ্গে এবং ওর নাবিকদের সঙ্গে।

উচিত ছিল দুজন মহিলার জন্যে কেবিনটা ছেড়ে দেওয়া। নেহাৎ ভদ্রতা সেটা। কিন্তু উইল হ্যালের কাছে সে ধরণের ভদ্রতা আশা করা বৃথা। সে এই যাত্রীদলকে কয়েক বস্তা চামড়ার বাণ্ডিলের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিল না।

পঞ্চাশ পাউণ্ডের খদ্দের আবার কত সুখ সুবিধা আশা করে? ভাবটা অনেকটা এই ধরণের।

জাহাজের খোলের মধ্যে ওদের যেখানে থাকতে দেওয়া হল সেখানে বুঝি গরু ভেড়াও রাখা চলে না। কোন জন্তু জানোয়ারের বাসোপযোগী নয় সে স্থান।

মরুকগে, সবাই নিজেদেব সান্ত্বনা দিল এই বলে যে, কটা দিন বৈতো নয়।

হাজার খানেক মাইলের রাস্তা।

যেতে বড় জোর পাঁচ ছয় দিন লাগবে।

যে নরকেই হোক, এ কটা মাত্র দিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। তাব উপর দেশে-ফিরে-যাওয়া মন কোন অসুবিধাকেই অসুবিধা বলে গ্রাহ্য করল না।

উইল হ্যালেকে এক কথায় বলা যায় অতি এক গুঁয়ে, গুণ্ডা প্রকৃতির, নিরক্ষর, ছোটলোক এক মাতাল বিশেষ।

এখন ভেতরে ভেতরে ডাকাত না হলেই রক্ষে।

একয়টা দিনবাত্রি অবশ্যই সজাগ ও সদাসতর্ক থাকতে হবে স্থির হল।

ঐ জানোয়ার সদৃশ উইল হ্যালে ও তার বশংবদ নাবিকদলকে বিশ্বাস নেই।

যেমন ক্যাপ্টেন তেমনি তাব চেলা চামুণ্ডা। যেন নন্দীভৃঙ্গি আর কি।

সেগুলোও পাকা নেশাখোর, বদ মেজাজী এবং জানোয়ার বিশেষ।

এখন ঈশ্বর ভরসা।

ভালয় ভালয় অকল্যাণ্ড পৌছলে তবে বাঁচা যায়।

## ॥ পাঁচ ॥

যথাকালে ২৭শে জানুয়ারী তারিখে 'ম্যাকোয়ারি' জাহাজ অকল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। জাহাজটা একটা অতি ভারী ও শ্লথগতি সম্পন্ন জলযান।

জন ম্যাঙ্গেলস নিজে একজন তরুণ সুদক্ষ ক্যাপ্টেন। সে দেখে শুনে একাধারে চিন্তিত ও হতাশ দুই-ই হল।

এরপর চারদিন কেটে গেল অর্থাৎ ৩১শে জানুয়াবী এল। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাহাজটি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মধ্যেকার সংকীর্ণ সমুদ্রপথের দুই তৃতীয়াংশও এগিয়ে যেতে সমর্থ হল না।

এ জাহাজের ক্যাপ্টেন হ্যালে কোন দিকে নজর দিচ্ছে না। কেবল নিজের কেবিনে বসে বসে নেশাভাঙে চুর হয়ে থাকছে। জাহাজ চলল কি থামল কোন দিকেই তার খেয়াল নেই। কি সাংঘাতিক কথা।

তার নাবিকদলও যেন প্রভুরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে! এখন বুঝি জাহাজকে তাব নিজেব চলবাব ভাব নিজেরই করে নিতে হবে—ভাবটা এই।

তবু জাহাজ চলছে। মাঝে মাঝে উইল হ্যালের বুঝি হুঁশ হয়। টলতে টলতে এসে গাল মন্দ কবে আদেশ নির্দেশ দিয়ে ফের গিয়ে ঢোকে তার কেবিনের কোটরে।

এ যাত্রীদলেব দু'একজন রগচটা লোক মাতাল ক্যাপ্টেনকে তার ঘরে বেঁধে আটকে রাখতে চায়। জন ম্যাঙ্গেলস থামিয়ে দেয়। ঠিক আছে। যখন তেমন তেমন অবস্থা দেখা যাবে তখন তো জাহাজ চালাবার ভার তার নিজেকেই নিতে হবে। যে করেই হোক অকল্যাণ্ড তো পৌঁছতেই হবে।

কিন্তু আশ্চর্য এ জাহাজে কোন 'সেইলিং চার্ট' নেই। যা প্রতিটি জাহাজে থাকা প্রয়োজন। তবে মনে হয় একই পথে উইলহ্যালে এই জাহাজ নিয়ে শত সহস্র বার যাতায়াত করছে তাই কোন 'চার্ট' রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। কেননা সমস্ত কিছুই তার কণ্ঠস্থ, সব কিছুই তার নখদর্পণে।

নেশাখোর হোক আর যাই হোক উইল হ্যালে যে একজন পাকা নাবিক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়।

এ দিককার সমুদ্রপথ ওর প্রকৃতই নখদর্পণে।

জলের তলায় এপথে রয়েছে অসংখ্য প্রবালের পাহাড়।

কোথাও জলের উপর সামান্য মাথা উঁচু করে জেগে আছে। কোথাও বা আছে জলের অল্প কিছু তলায় আত্মগোপন করে।

এই সব জলে ডোবা পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে আর রক্ষে নেই।

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের দফা রফা হয়ে যাবে। অর্থাৎ তলা ফুটো হয়ে অবশ্যম্ভাবী সলিল সমাধি।

কিন্তু তা, দেখা গেল মাতাল ক্যাপ্টেন যে ভাবেই হোক এই বিপদসংকুল জলপথে জাহাজকে চালিয়ে তো নিয়ে যাচ্ছে।

জন ম্যাঙ্গেলস্ প্যাগানেল উইলসন এবং অবশ্য সদা সতর্ক প্রহরায় রয়েছে ডেকের উপরে। কোন কিছু চাল বেচাল দেখলেই নিজেদের হস্তে জাহাজের পরিচালনা ভার তুলে নেবে।

ডাকাত নয়ত এই উইল হ্যালেটা। কে জানে দেখাই যাক।

জল শুধু জল। চতুর্দিকে নীলাম্বুরাশির মধ্য দিয়ে চার চারটে দিন কেটে গেল।

এর ভেতর ছোটখাটো ঝড় ঝাপটা কত এল কত গেল তার হিসেব কে রাখে। গরু ভেড়া থাকার অযোগ্য স্থানে থেকে যাত্রী দলের আর কষ্টের অবধি রইল না।

বিশেষ করে মেয়েদের অবস্থা হল শোচনীয়। এত কষ্ট তারা

জীবনে পায়নি। তবু মুখ ফুটে কোন অনুযোগ বা বিরক্তি প্রকাশ তারা করল না।

হিসেব মত দিন পাঁচেক লাগবার কথা এই সমুদ্রপথ পেরিয়ে গন্তব্যস্থল অকল্যাণ্ড বন্দর পৌঁছুতে।

কিন্তু পাঁচদিন গেল…ছদিন গেল…সাত দিনও যায় অথচ ডাঙার কোন পাত্তা নেই। অকল্যাণ্ড তো দূরস্থান।

এবার সবাই চিন্তিত হয়ে উঠল, শংকিত হয়ে উঠল। ব্যাপার কি? এ তো ভাল কথা নয়!

ভৌগোলিক প্যাগানেল ক্যাপ্টেনকে জিগ্যেস করে আর কত দিন লাগবে অকল্যাণ্ড পৌঁছতে। কোন ভুল পথে…মানে…। তদুত্তরে খেঁকিয়ে উঠে ক্যাপ্টেন উইলহ্যালি যাত্রীদলকে তার কার্যে নাক না ঢুকিয়ে নিজেদের চরকায় তেল দিতে উপদেশ দিয়েছে।

শুনে যাত্রীরা ক্রুদ্ধ হল সন্দেহ নেই। একটি ঘুষিতে নাক ফাটিয়ে দেবার বাসনাও যে দু'একজনের না হল এমন নয় কিন্তু তারা অবস্থা বিপাকে সে ক্রোধ অতি কষ্টে ঢোঁক গিলে হজম করল।

কেননা ওকে মেরে ফেললে বা জখম করলে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। এ দিককার সামুদ্রিক রাস্তা ঘাট কারুরই ভাল ভাবে জানা নেই।

প্রবাল পাহাড়ের বিপদ সংকুলতা রয়েছে ডাইনে বাঁয়। অতএব চুপচাপ থাকাই বর্তমানে বুদ্ধিমানের কাজ। দেখাই যাক ব্যাপার কত দূরে গড়ায়।

ডেকে দাঁড়িয়ে দূরের পানে দৃষ্টি মেলে ব্যাগ্র ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন লর্ড গ্লেনার ভ্যান।

—লর্ড শীপ কি ডাঙার খোঁজ করছেন? জন ম্যাঙ্গেলস প্রশ্ন করে।

গ্লেনারভ্যান মাথা নাড়লেন।

—ঠিকই, আমাদের অন্তত এখন থেকে ছত্রিশ ঘণ্টা আগে অকল্যাণ্ড পৌঁছন উচিত ছিল।

লর্ড কোন জবাব না দিয়ে টেলিস্কোপে চোখ রেখে দেখতে লাগলেন।

—লর্ড, ডাঙা কিন্তু ঐ দিকে হবে না। ডাঙা হলে হবে স্টার বোর্ডের দিকে।

—আমি ডাঙা খুঁজছি না হে, এতক্ষণে লর্ড মুখ খুললেন।

—তা হলে কি খুঁজছেন লর্ড?

—আমি খুঁজছি···আমার···'ডানকান' জাহাজকে। বিরক্তিতে লর্ডের কণ্ঠ তিক্ত শোনালো, সে হয়ত এখন ঐ বদমাসগুলোর কবলে থেকে জলদস্যুতায় সহায়তা করে বেড়াচ্ছে এই অঞ্চলে। আমার কেমন ধারণা হচ্ছে হয়ত 'ডানকান'কে এখানে দেখতে পাব।

—ঈশ্বর যেন সে ঘটনা থেকে আমাদের রক্ষা করে।

—একথা কেন বলছ জন?

—লর্ড শীপ আপনি পবিস্থিতিটা বিস্মৃত হচ্ছেন। যদি 'ডানকান' এসে হানা দেয় এ জাহাজে তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন কি? আমরা না পারব পালাতে না পারব কোথাও যেতে। জলদস্যুদের হাতে বন্দী হয়ে ওদের অত্যাচার ও করুণার ওপর বাস করতে হবে। আমরা অবশ্য প্রাণের পরোয়া করি না কিন্তু ভেবে দেখুন লর্ড, মেরি গ্রাণ্ট ও লেডি গ্লেনারভ্যানের কি হবে!

—উঃ ভাবতে পারি না ওকথা, লর্ড শুনে শিউরে উঠেন, জন আমি হতাশার চরম সীমানায় পৌঁচেছি।

—আপনি ভয় পাবেন না লর্ড। আমি আছি যে করেই হোক আমরা ডাঙাতে পৌঁছবই। আমি সমুদ্রের দিকে নজর রাখছি। তবে 'ডানকানে'র সঙ্গে যেন দেখা না হয়।

## ॥ ছয় ॥

সেদিন রাত্রি ঘনিয়ে এল বড় ভয়াবহভাবে। অনেক আগেই ঘনতমসাবৃত হয়ে গেল চতুর্দিক।

আকাশের অবস্থাও ভয়ংকর।

উইল হ্যালে ও তার নাবিকদলের বুঝি নেশাগ্রস্ত মনেও টনক নড়ল। চেঁচামেচি হাঁকডাক করে যথোচিত পাল ওঠানো নামানোব ব্যবস্থায় তারা লেগে গেল।

প্রবল বাতাস বইতে শুরু করল। তুফানও বলা যায়। সমুদ্র যেন ক্ষেপে গেল।

বিশালকায় এক একটা ঢেউ এসে ডেকের উপর দিয়ে আছড়ে পড়তে লাগলো!

গতিক ভাল নয়।

রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ ঢেউএর প্রচণ্ডতা ও গর্জন বেড়ে গেল।

তাহলে কি ডাঙার নিকটবর্তী হয়েছে জাহাজ। অগভীর তীরভূমি সংলগ্ন সমুদ্রে এসে পড়ল কি। জল মাপো তো দেখি। দড়ি ফেলে জল মেপে দেখা গেল সত্যিই তাই। জলের গভীরতা মাত্র তিন ফ্যাদম।

প্রবল হাওয়ায় জাহাজ চলেছে। এ কি সোজা তীরভূমির দিকে গিয়ে ধাক্কা মারবে নাকি রে বাবা!

উইল হ্যালে বুঝি মাথার ঠিক রাখতে পারছে না। নেশায় তার মাথার ঠিক নেই। বাধ্য হয়ে জন ম্যাঙ্গলস এসে হাল ধরল।

জনের পারদর্শী হাতে জাহাজ কিঞ্চিৎ বিপদমুক্ত হল বটে তবে সরাসরি গিয়ে তীরে ধাক্কা মারবে কি না সে সম্বন্ধে তখনও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না।

এরই কিছুক্ষণ বাদে একটা ঝাঁকুনি লেগে সকলে এদিক সেদিকে

ছিটকে পড়ে গেল। আর জাহাজ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে ঝাঁকুনিতে জাহাজের কাঁচের জানালাগুলি ঝন ঝন শব্দে ভেঙে পড়ল।

চারদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার, তার উপর তখনও তুফান পুরোদমে চলছে।

জন ম্যাঙ্গেলস বুঝলো যে জাহাজ অগভীর জলে বালিতে আটকে গেছে।

—কি হল জন? লর্ড গ্লেনারভ্যান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

—বালিতে আটকে গেছে। ভয় নেই লর্ড, জাহাজ ডুববে না। জন অভয় দেয়।

—এখন তো মাঝ রাত্তির, তাই না?

—হ্যাঁ লর্ড। আমাদের সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

—এখনই নৌকো নামানো যায় না?

—না লর্ড। এ অন্ধকারে এবং এই উত্তাল সমুদ্রে সেটা অসম্ভব। তার উপরে কোথায় তীরভূমি তাও তো আমরা জানি না।

—বেশ, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।

মেয়েদের নিয়ে ওরা ছিল ডেকের তলায় জাহাজের খোলের মধ্যে। সবাই মিলে চারদিক খুঁজে দেখতে লাগলো জাহাজের তলা কোথাও ফুটো হয়েছে কিনা। সাবধানের মার নেই। না—ফুটো হয়নি।

কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো সবাই।

ইতিমধ্যে দেখা গেল ক্যাপ্টেন হ্যালে যেন পাগলের মতো ডেক ময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। নেশার ঘোরে সে আর মানুষ নেই। তার নাবিকদল ও নেশাভাঙ করে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

জন দেখলো সব। মনে মনে প্রমাদ গণলো। এই উন্মাদ দলের দ্বারা যে কোন অনিষ্ট সম্ভব। এদের সামলাতে পারত ক্যাপ্টেন। কিন্তু সে নিজেও তো বেসামাল। সে নিজে নিজের চুল টানাটানি করে মুঠো মুঠো ছিঁড়ছে।

নাবিকদল নেশায় উগ্রচণ্ডী হয়ে উঠেছে সব। কি বীভৎস চিৎকার করে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। ভয়াবহ হুঙ্কার, গর্জন এদের উদ্দেশ্য বুঝতে এক মুহূর্তও দেরী হয়না। মেয়েদের কথা ভেবে সবাই প্রমাদ গনলো। জন নিজ সঙ্গীদলকে এদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সশস্ত্র হতে নির্দেশ দিল।

—খোলের মধ্যে নিচে নেমে আসবার যে ব্যাটা চেষ্টা করবে, মেজর দাঁত কিড়মিড় করে গর্জে ওঠেন, সে ব্যাটাকে কিংবা তার সঙ্গী-সাথীকে সেই মুহূর্তে জানে খতম করে দেব।

নেশাগ্রস্থ নাবিকেরা যখন বুঝলো যে যাত্রীদল সশস্ত্র তখন কয়েকবার এগিয়ে পেছিয়ে আক্রমণ করবার বৃথা চেষ্টার পর ভয় পেয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

ওরা সবাই সতর্ক হয়ে রাত্রি প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

একি বিপদে পড়লো বল দিকিনি।

স্পষ্ট বোঝা গেল এই উইল হ্যালের চেলাচামুণ্ডারা নিশ্চিত দস্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। এদের হাত থেকে যুদ্ধ ব্যতীত মুক্তি নেই।

ভয়ংকর দুশ্চিন্তায় রাত কেটে গেল।

ভোরের আলো দেখা দিতেই রবার্ট ও প্যাগানেল সন্তর্পণে উপরে উঠে এল।

দেখা যাক কি ব্যাপার। এর একটা বিহিত করতেই হবে। উইল হ্যালের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন।

উপরে উঠে কিন্তু বিস্মিত হয়ে গেল ওরা।

ডেকের উপর একটি প্রাণীকেও দেখা গেল না। কেউ কোথাও নেই।

চারদিকে জনমানবহীন মৃত্যু নীরবতা বিরাজ করছে।

সবাই ভাবল, ক্যাপ্টেন হ্যালে এবং তার চেলা চামুণ্ডার দল বোধকরি নেশাভাঙের প্রচণ্ডতার ফলে বর্তমানে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

কেবিনের কাছে এসে ওরা আরও বিস্মিত হয়ে গেল। কেবিনের দরজা খোলা—ক্যাপ্টেন নেই।

শুধু ক্যাপ্টেনই নয়, খুঁজে দেখা গেল নাবিকদলও নেই। জাহাজের কোথাও নেই।

সে কি! তাজ্জব কাণ্ড মনে হচ্ছে। লোকগুলো গেল কোথায়?

সহসা নজরে পড়লো জাহাজেব সবেধন নীলমণি নৌকোটিও নেই।

তবে কি জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছে সব? হ্যাঁ, প্রকৃতই তাই। প্রাণভয়েই নৌকো নিয়ে রাতাবাতি পালিয়েছে সব। ওবা বুঝেছে যে এই যাত্রীদলের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র বযেছে। এদের সঙ্গে ত্যাণ্ডাই মেণ্ডাই করে সুবিধে হবে না। চাল বেচাল কবতে গেলে পৈতৃক প্রাণটাই শেষকালে যাবে। তার চেযে যঃ পলায়তি···এই পন্থা অনুসরণ কবাই হবে বুদ্ধিমানেব কাজ। অতএব জাহাজেব একমাত্র নৌকোটি জলে ভাসিয়ে কেটে পড়েছে সবাই।

কিন্তু পালালো কোথায়? এ অথৈ সমুদ্রে কোথায় গেল?··· আরে, ঐ তো দূরে দেখা যাচ্ছে তটবেখা। নিউজিল্যাণ্ডেব উপকূল? হ্যাঁ তাই। আন্দাজ আট নয় মাইল পথ হবে।

বেটারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে ঐ দেশে নেমে পালিয়েছে।

বলিহারি পরিস্থিতি। অদ্ভূত ঘটনা।

জাহাজ আটকে বয়েছে বালিব চড়ায়, চতুর্দিকে উত্তাল সমুদ্র। দূবে তীরভূমি দেখা যাচ্ছে অথচ হাতে কোন নৌকো নেই।

অভূতপূর্ব অবস্থায় পড়লেন লর্ড ও তাঁব সঙ্গীদল।

সকলে মিলে অনেক বকম সলাপবামর্শ কবা হল কিন্তু কোন কিছু সিদ্ধান্তে পৌছনো গেল না।

অবশেষে স্থিব হল জাহাজটাকে কোন প্রকারে ভাসানো যায় কিনা সে চেষ্টাই প্রথমে করা যাক। পবে অন্য কাজ।

জোয়ারের সময় নোঙর নামিয়ে দিয়ে জাহাজ ভাসাবার চেষ্টা করা হল।

কিন্তু সবই নিষ্ফল হল। পারা গেল না তা। ভীম আটকানো আটকেছে জাহাজ বালির চড়ায়।

চল্লিশ ঘণ্টা বাদে ফের জোয়ার। পুনরায় চেষ্টা করা হল পরদিন। এবারও একই অবস্থা। উঠল তুললো ফের বসে গেল বালিতে। জাহাজকে ভাসানো গেল না কোন মতে।

অচল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ম্যাকোয়ারি জাহাজ। এক ইঞ্চিও তাকে নড়ানো সম্ভব হল না।

এখন উপায়? উপায়, ভেলা বানানো। এ ছাড়া পরিত্রানের আর দ্বিতীয় পথ নেই।

যে কোন উপায়েই হোক তীরে তো যেতেই হবে।

অচল অনড় অবস্থায় এ জলে থাকলে কিছুকালের মধ্যেই নিশ্চিত মৃত্যু। তাই ডাঙাতে উঠতেই হবে।

অতঃপর ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় তো হাঁটা পথে এক সময় অকল্যাণ্ড পৌঁছনো যাবেই।

প্যাগানেল প্রশ্ন করে যে উক্ত ভেলায় করে ভেসে ভেসে সোজা অকল্যাণ্ড পৌঁছনো যাবে কিনা ডাঙার পথ এড়িয়ে।

জন ম্যাঙ্গলস জবাব দেয়, তা অসম্ভব। ভেলায় ভেসে যাওয়া অসম্ভব।

—ভেলায় সম্ভব নয় বলছ কিন্তু ঐ নৌকোয় সম্ভব হত কি?

—তা হত।

—ইস্ ঐ উইল হ্যালে ব্যাটাদের উপর এত রাগ হচ্ছে।

জন ম্যাঙ্গলস হাসল, বললে, তবে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে ঐ মাতাল নাবিকদল ও তাদের মাতাল ক্যাপ্টেন ঐ অন্ধকার রাতে, এই উত্তাল সমুদ্রে কখনোই জীবন নিয়ে ডাঙায় উঠতে সক্ষম হয়নি। ওরা অবশ্যই ডুবে মরেছে।

—বেশ হয়েছে। কিন্তু নৌকোটা পেলে আমাদের কতই না উপকার হত।

—এ ভেলাও নির্বিঘ্নে আমাদের তীরে পৌঁছে দেবে।

—আমি ঐ তীর ভূমিটাকেই এড়িয়ে যেতে চাইছি, প্যাগানেল বললে।

—কেন, কুড়ি বাইশ মাইল পথ আর এমন অসুবিধের কি?

—বন্ধু, প্যাগানেল বলে, কুড়ি মাইল কিছু নয় ঠিকই। এ পোড়া দেশ ছাড়া আর যে কোন দেশে আমি নির্ভয়ে এর চতুর্গুণ পথ যেতে রাজী। কিন্তু এ দেশে নয়!

—নিউজিল্যাণ্ডকে কিসের ভয়? লর্ড প্রশ্ন করেন।

—এ দেশের আদিম অধিবাসীদের ভয়।

—আমরা দশ জন ইয়োরোপীয়ান আছি, ঐ নেটিভদের ভয় করতে যাব কোন দুঃখে।

—ওদের ছোট করে ভাবা উচিত হবে না লর্ড, প্যাগানেল বললে, এ দেশের অধিবাসীরা ভয়ানক শক্তিশালী উপজাতি। এরা সর্বশক্তি দিয়ে ব্রিটিশ শাসনকে প্রতিরোধ করে চলেছে। আক্রমণকারীদের সঙ্গে লড়ছে, শত্রু জয় করে সুযোগ পেলেই তাদের ধরে ধরে খাচ্ছে।

—খাচ্ছে? তাহলে নরখাদক? অ্যাঁ?

—হ্যাঁ তাই, বলে প্যাগানেল নিউজিল্যাণ্ড সম্বন্ধে অনেক তথ্য, অনেক ইতিহাস বলতে শুরু করে।

## ॥ সাত ॥

নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীদের নাম "মাউরী" প্যাগানেল সুগম্ভীর কণ্ঠে বলে চলে, ওদের মত হিংস্র প্রকৃতির মানুষ পৃথিবীতে বিরল।

দেশটা বর্তমানে যদিও ইংরেজদের অধিকারেই রয়েছে তবু সত্যি কথা বলতে গেলে মাউরীদের শাসন করতে গিয়ে তারা প্রতি পদে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

আজ পর্যন্ত দেশের সমস্ত স্থান তো অধিকারে আনতে পারেই নি উপরন্তু যে কটা শহর বন্দর হাতে আছে সেগুলোকেও রক্ষা করা অতীব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই আছে। এ দেশীয় লোকগুলি নিপুণ যোদ্ধা আর ভয়াবহ দুঃসাহসী।

এই 'মাউরী'রা যে কোন ইয়োরোপীয় বিশেষ করে শাদা চামড়া ইংরেজদের ওপরে হাড়ে চটা।

—অ্যাঁ! বলে কি!

—হ্যাঁরে ভাই এর একটি কথাও মিথ্যে নয়, এই জন্যেই তো বলছি এ দেশের ভেতর দিয়ে পদব্রজে যাওয়া আর যমপুরীর মধ্যদিয়ে যাওয়া একই কথা।

অথচ ভেলাটাকে নিয়ে সোজাসুজি জলপথে অকল্যাণ্ডে যাওয়া নাকি অসম্ভব। জন জানিয়েছে এই ক্ষণভঙ্গুর ভেলা অতটা সমুদ্র-পথের ধকল সইতে পারবে না।

অথচ মাউরীরা পুরোপুরি নরখাদক।?

শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে রইল। কারুর মুখে আর কোন কথা বের হল না কিছুক্ষণ।

—আগেই বলেছি এরা যুদ্ধবন্দীদের খেয়ে ফেলে, প্যাগানেল বলে যায়। এদের বিশ্বাস বন্দীদের ধরে খেলে তাদের শৌর্য বীর্য সাহস সব কিছু নিজেদের শরীরে এসে যায়। আমরা যুদ্ধে মৃত ব্যক্তিদের কবর দিই, আর এরা মজা করে সেগুলোকে খেয়ে ফেলে। নরমাংসের মত সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর খাদ্য আর বুঝি নেই কিছু এদের কাছে।

—এরা তো শুনেছি খৃষ্টান?

—সামান্য অংশ মাত্র খৃষ্টান। আর খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে কত মিশনারী যে এদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন তার আব লেখা-জোকা নেই। তবে শুনুন, গত বছরে বেভাবেণ্ড ওয়াকনার নামক জনৈক মিশনাবীকে এরা অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে। সে বীভৎস কাণ্ড শুনলে সবাঙ্গ শিউবে ওঠে। মাউরীদের স্ত্রীলোকেবা রেভাবেণ্ডের চোখ উপড়ে খেয়ে নেয়। ঢক ঢক করে রক্তপান করে। চেখে চেখে খায় ঘিলু। অবশেষে পুরুষেরা তার মাংস সোল্লাসে ভক্ষণ করে।

—উঃ কী ভয়ানক!

—কী জঘন্য অসভ্য জীব রে বাবা। বলিহারি এদেব ধর্ম আর সংস্কারকে, বলে নাসিকা কুঞ্চন করেন লর্ড গ্লেনারভ্যান।

—ধর্ম বা সংস্কারই শুধু নয়, নরমাংস ভক্ষণের পেছনে আরেকটা বড় কারণ বিদ্যমান, প্যাগানেল বলে চলে, মানুষের মাংস মানুষ খেতে আরম্ভ করে ক্ষিধে থেকে।

—ক্ষিধে থেকে?

—হ্যাঁ ক্ষিধে থেকে, প্যাগানেল বলে যায়, প্রচণ্ড ক্ষিধের তাড়নায়ই জংলীরা এই জঘন্য প্রবৃত্তিতে আসক্ত হয়। কিছু মনে করবেন না, প্যাগানেল লর্ডের দিকে চেয়ে বলে, আজকের অনেক সুসভ্য জাতির পূর্বপুরুষদেরই এ অভ্যেস কিছু কিছু ছিল।

প্যাগানেল বলে, এমনকি আপনাদের স্কচ জাতির মধ্যেও এ অভ্যাসের নিদর্শন আছে। ইংরেজ জাতির মধ্যেও আছে। আজ থেকে বেশী দিনের কথা নয়, রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে, হয়ত

তখন সেক্সপীয়র 'সাইলক' চরিত্র রচনায় ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়ে সনিবিণ নামে জনৈক দস্যু নরমাংস খাওয়ার অপরাধে ধৃত হয়।

এটাকে আপনি কি বলবেন?

আপনি কি বলবেন এটা সে ধর্ম বা সংস্কারের প্রভাবে করেছিল? মোটেই তা নয়। করেছিল স্রেফ ক্ষিধের জ্বালায়। যাকে বলে জৈবিক অসহ্য ক্ষিধে। Survivors ate the dead body of Co-passenger during a plane Crash in S. America.

—ক্ষিধে! আশ্চর্য তো! জন ম্যাঙ্গলস্ বিস্ময়সূচক ধ্বনি করে।

—হ্যাঁ তাই। তাছাড়া মাউরারা তো পুরোপুরি নিরামিশ ভোজী নয়। অতএব ওরা যদি—

—ওরা তো পশুর মাংসও খেতে পারে?

—তা হয়ত পারত। কিন্তু আসলে ওদের দেশে পশু অতি কম। গরু ভেড়া প্রভৃতি চারপেয়ে জন্তু ওদের দেশে নেই বললেই চলে। এমন কি পাখীও খুব বিরল এই দেশে। তাই ওরা মজা করে মানুষের মাংসই খেয়ে থাকে।

জনৈক মিশনারী একবার একজন মাউরী সর্দারকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিল। এটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ বলে অভিহিত করেছিল।

তার উত্তরে সেই সর্দার বলেছিল, কেন? এতে দোষের কি আছে? মাছেরা মাছ খায়। কুকুরে মানুষ খায়। মানুষে কুকুর খায়। আর আমাদের ধর্মপুরাণ রয়েছে যে একজন দেবতা পর্যন্ত আরেকজন দেবতাকে খেয়েছিল। সুতরাং আমরা যদি আমাদের স্বজাতি মানুষের মাংস খাই এতে দোষের কি আছে, তা তো ভেবে পাই না।

মাউরীরা যে শুধু যুদ্ধবন্দীদেরই খায় এমন নয়, নিজেদের আত্মীয়-স্বজন মরলেও তাদের দেহ কচকচিয়ে খেয়ে ফেলে।

এ থেকে একমাত্র রেহাই পায় ওদের রাজার বা সর্দারের মৃতদেহ। সে দেহ সমাধি দেওয়া হয়। সে দেহ খাবার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

রাজা বা সর্দার মারা গেলে তাঁদের স্ত্রীদেরও সহমরণে যেতে হয়। আরও অবাক কাণ্ড যে তাঁদের চাকরবাকরদেরও সহমরণে যেতে হয়।

চাকরবাকর কেন?

ওদের বিশ্বাস চাকরবাকরদের হত্যা করে প্রভুর সঙ্গে না দিলে পরকালে গিয়ে তাঁদের সেবা শুশ্রূষা করবে কে?

এতকাল কালো চামড়া খেয়ে খেয়ে ওদের বোধকরি এক ঘেয়ে ভাব এসে গিয়েছিল—তাই বর্তমানে সাহেবদের অর্থাৎ সাদা চামড়ার মানুষ খেয়ে মুখ পালটাচ্ছে। হয়ত বা এ মাংস ওদের কাছে আরও বেশী সুস্বাদু আর মিষ্টি লাগে। তাই সাদা চামড়া পেলে ওরা আর বিশেষ বিলম্ব করে না।

—ওরা কি মানুষের মাংস কাঁচা-ই খায়?

—তার কোন ঠিক নেই। কখনো কাঁচা, কখনো আগুনে ঝলসে নিয়ে। তবে শুনেছি, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রান্না করে নেয়। রান্নায় নাকি খুব ওস্তাদ ওরা।

এইসব রোমহর্ষক সাংঘাতিক কাহিনী শুনে ভয়ে আতংকে সবাই হতবুদ্ধি হয়ে রইল।

মেয়েদের অবস্থা হল অবর্ণনীয়। চোখ মুখ পাংশু হয়ে উঠল আতংকে।

সামনে ক'টি পথ এখন উন্মুক্ত: এক হয় সমুদ্রে এই বালিতে আটকানো জাহাজে থেকে অনাহারে অপঘাত, নয়ত সমুদ্রে ডুবে মরা, অথবা তীরে গিয়ে জংলীদের হাতে পড়া।

এ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অবশ্য বিপদের সম্ভাবনা যত বেশীই থাক না কেন; এমন কি এর চেয়ে শতগুণ বেশী থাকলেও তবুও ওরা তীরে নামাই বাঞ্ছনীয় মনে করত।

কেন না জলপথে যাবার উপায়ই বা কি। অকল্যাণ্ড পৌঁছবার চেষ্টা তো করতেই হবে। তারপর বরাতে যা আছে তা হবার হবে।

নৌকো থাকলে কত দ্রুত চলে যাওয়া যেত।

## ॥ আট ॥

পরদিন জাহাজ ভাসাবার চেষ্টা না করে সবাই লেগে গেল ভেলা তৈরী করতে।

মাস্তুলের কাঠ কেটে, লম্বা লম্বা তক্তা পেতে সেগুলোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বিরাট আকারের এক ভেলা শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত হল।

সমুদ্রের লোনা জলের ঝাপটা থেকে বাঁচবার জন্য ভেলার তলায় কয়েকটা খালি ড্রাম বেঁধে তাকে উঁচু করাও হল বেশ খানিকটা।

তারপর উপযুক্ত পরিমান খাদ্যদ্রব্য এবং ক্যাপ্টেন উইল হ্যালেদের ফেলে যাওয়া কিছু গোলাগুলি নিয়ে দশজন যাত্রী উঠে পড়ল ভেলায়।

ভেলা ভাসলো তীরভূমির উদ্দেশ্যে।

অদূরে নিউজিল্যাণ্ডের উপকূল। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা দেশ। শহর বন্দর কত দূরে কে জানে!

এদিকটা হয়ত বা অসভ্য আদিম অধিবাসীদের আস্তানাস্থল। হয়ত দুর্ভাগ্যক্রমে গিয়ে তাদের পাল্লায়ও পড়ে যেতে পারে দলটি।

কোন কিছুই স্থির নিশ্চয় করে বলা যাচ্ছে না। অজানা অচেনা পাড়ি।

এর চেয়ে দ্রুত যাওয়া যেত নৌকো হলে। কিন্তু এ তো নৌকো নয় শ্লথগতি ভেলা।

ঢিমে তেতালায় ভাসতে ভাসতে চললো।

দূর চক্রবালের তীর-রেখা ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগলো।

প্রায় চার ঘণ্টা লাগলো তীরের নিকট পৌছতে।

ইতিমধ্যে এক সময় জলের ওপর কি একটা কালো রঙের লম্বা বস্তু ভাসতে দেখা গেল।

প্রথমে ওরা ভাবলে মাছ নাকি রে বাবা। কিন্তু দূরবীন যন্ত্রে দেখে বোঝা গেল ওটা একটা নৌকো। ওলটানো নৌকো।

কাছে আসতে সন্দেহ রইল না যে সেটা ম্যাকোয়ারি জাহাজেরই সেই নৌকো।

তাহলে যা ভেবেছিল তাই। দুর্যোগের রাত্রে নেশায় বেসামাল অবস্থায়, পাগলা সমুদ্র দিয়ে পালাবার মুখে উক্ত ক্যাপ্টেন উইল হ্যালে এবং তার দুষ্ট নাবিকদল প্রবাল পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে, নৌকো উলটে সলিল সমাধি হয়েছে।

প্রাণ দিয়ে তারা তাদের দুষ্ট ও দুর্বুদ্ধির প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে।

জল কম থাকায় তীর থেকে বেশ কিছু দূরে এসেই ভেলা থেমে গেল। আর যাবে না। এবার হেঁটে যেতে হবে।

পুরুষেরা সব হাঁটু জলে নামলো—মেয়েরা ছাড়া।

মেয়েদের পাঁজা-কোলা করে তীরে পৌঁছে দেওয়া হল।

তারপর প্রত্যেকে এক একটি করে মালপত্র বহন করে নিয়ে গেল তীরে।

ভৌগোলিক প্যাগানেল হিসেবপত্র কবে বললে, এ তীরভূমি থেকে অকল্যাণ্ড অন্তত সত্তর আশি মাইল দূর হবে।

লর্ড গ্লেনারভ্যান প্রস্তাব করেন সমুদ্র উপকূল ধরেই অগ্রসর হবার। বনজঙ্গলা পথ পরিহার করাই সমিচীন! আর অযথা কালক্ষয় না করে অবিলম্বে যাত্রারম্ভ করাই প্রয়োজন।

শুভস্য শীঘ্রম।

কিন্তু শুভস্য শীঘ্রম করা সম্ভব হল না। কেননা প্রাকৃতিক বাধা এল প্রথমে।

বেলা এগারোটা নাগাদ আকাশ ছেয়ে এল মেঘে। কাজল কালো মেঘ! দুনিয়া অন্ধকার করে ফেললো।

তারপর শোঁ শোঁ করা ঝড়, সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। প্রলয়ংকর বৃষ্টি। সৃষ্টি বুঝি ভেসে যায় এমন বৃষ্টি শুরু হল।

অগত্যা যাত্রার আশায় জলাঞ্জলী দিয়ে, বাধ্য হয়ে দলটি নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়ে সে দুর্যোগের হাত থেকে সাময়িক নিস্তার পেল।

দেখে শুনে মনে হল, বৃষ্টি শিগ্‌গির থামবে না।

অতএব ধরে নেওয়া যায় আজকের দিনটা কাটে আর রাত্তিরে এ অজানা অচেনা দেশে পথ চলা তো প্রশ্নাতীত ব্যাপার। আদৌ নিরাপদ নয়।

অর্থাৎ বৃষ্টি থামলে আগামীকাল সকালের আগে আর যাত্রা শুরু করা সম্ভব নয়।

সুতরাং থাকতেই যখন হবে, পেটের কথা ভুললে চলবে না। আহারের বন্দোবস্ত করতেই হবে।

পাচক অলবিনেট তাই খাবার দাবার প্রস্তুতের জোগাড়ে লেগে গেল।

জিনিস পত্তর বিছিয়ে আজকের দিন ও রাত কাটাবার ব্যবস্থা হল।

প্রচুর সময় হাতে। নানা আলোচনা চলতে লাগলো নিজেদের মধ্যে। বিবিধ বিষয়ে বিচিত্র আলোচনা।

যেহেতু ভৌগোলিক প্যাগানেল প্রায় সর্বজ্ঞের মত এদেশের নাড়ী নক্ষত্রের ইতিহাস জানে, তাই তার মুখেই সব কিছু শোনা গেল।

এদেশের ইতিহাস তার মুখস্ত।

প্যাগানেল বললে ঃ

নিউজিল্যাণ্ডবাসীরা ছিল স্বাধীন। কোন ইয়োরোপীয় শক্তি তখন পর্যন্ত এই সুদূর দেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করবার স্বপ্নও দেখেনি।

অবশেষে একদা এখানে এল ইংরেজরা।

মিশনারীরা অবশ্য এর অনেক আগেই এসেছিল ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে।

ইংরেজগণ এসে মিশনারীদের শরণাপন্ন হল। মিশনারীদের সাহায্যে তারা এদেশীয় বহু সর্দারকে নিমন্ত্রণ করল একদা।

সর্দাররা এসে জমায়েত হতে ইংরেজরা তাদের মনোগত বাসনা ব্যক্ত করল। ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না সে ব্যাপারে।

ইংরেজরা সেই সর্দারদের বললে, আপনারা আমাদের অধীনতা স্বীকার করুন।

ইংরেজরা সোজা সরল ভাষায় সর্দারদের বললে যে 'মাউরী'রা যদি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজা হতে চায় তো মহারাণী সাহ্লাদে মাউরীদের সর্বতোভাবে রক্ষনাবেক্ষণেব ভার গ্রহণ করবেন। কিছু কিছু সর্দারকে দিয়ে ইংবেজরা এই মর্মে মহারাণীব কাছে এক আবেদন পত্রেও সই করিয়ে নিল।

অবশ্য অধিকাংশ সর্দাবই বুঝেছিল এব অর্থ কি। অর্থ হল নিজেদের স্বাধীনতাকে সোজা কথায় বিক্রয় করা।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হবসন নামে জাহাজের এক ক্যাপ্টেন সেখানে এক জাহাজ সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয়ে মাউবীদের জানালো যে মহারাণী তাদের বক্ষণার্থে সৈন্যদল ও জাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু ভয় প্রদর্শন কবে পুবোপুরি কাজ হল না। এই ব্যাপারে দাসত্বের ইঙ্গিত পেয়ে প্রায় প্রতিটি সর্দারই বেঁকে বসলো।

কিন্তু পরে ঘুষ ও উপহারেব বন্যায় প্রলুব্ধ করে কিছু সর্দারকে ফাঁদে ফেলে কবলস্থ করা সম্ভব হল।

এবং তারপর থেকেই শুরু হল সংঘর্ষ। স্বাধীনতা কামী মাউরীদের নিরবচ্ছিন্ন লড়াই।

বেশীরভাগ জংলী অধিবাসীরাই রয়ে গেল স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত।

ইংবেজরা দ্বীপের উত্তরাংশের সমুদ্র তীরবর্তী কিছু কিছু অঞ্চল নিয়ে রাজত্ব আরম্ভ করল।

আর সেখান থেকে মাঝে মাঝে দক্ষিণ দেশের অভ্যন্তরে সৈন্য পাঠিয়ে লড়াই চালাতে লাগলো।

কিন্তু লড়াইয়ে খুব সুবিধে করে উঠতে পারল না।

মাউরীরা অতি নিপুণ যোদ্ধা। এদের চেহারাও তেমনি—দৈর্ঘে ছয় ফুট।? যেমন বলিষ্ঠ তেমনি শক্তিশালী, এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়।

তার উপরে স্বাধীনতা কামী বিদ্রোহী মাউরীদের নেতা হল একজন অতি চতুর ও পরাক্রমশালী মানুষ। নাম তার উইলিয়ম টমসন।

এদেশে একদা পোটাটাউ নামে জনৈক রাজা ছিলেন।

বর্তমানে তিনি মৃত।

তাঁরই সুযোগ্য এবং বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিল এই উইলিয়াম টমসন।

নাম শুনলে মনে হতে পারে শ্বেতাঙ্গ মানুষ।

কিন্তু তা নয়। উইলিয়াম টমসন হল এদেশীয় লোক। জংলী খৃষ্টান।

## ॥ নয় ॥

এই উইলিয়ম টমসনের নেতৃত্বে প্রায় সোয়া লক্ষ জংলী অধিবাসীদের মধ্যে তিরিশ হাজার সুনিপুণ নেটিভ যোদ্ধা ইংরেজ সরকারকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছে।

টারানাকি নামক স্থান হল বিদ্রোহী মাউরীদের ঘাঁটি।

সেখানে সুগঠিত ও প্রায় দুর্ভেদ্য দুর্গ করে বসেছে তারা। অঞ্চলটিও খুবই দুর্গম, পর্বতসংকুল ও নিবিড় বনে ঘেরা।

লড়াই শুরু হয়, চলতে থাকে, এখানে সেখানে খণ্ড খণ্ড ভাবে। কখনো সম্মুখ, কখনো চোরা গোপ্তা যুদ্ধ চলে।

—আর সব থেকে ভয়ের কথা এই যে, উৎকণ্ঠিত স্বরে প্যাগানেল বলে ওঠে, আমরা খুব সম্ভব সেই বিপদসংকুল টারানাকি অঞ্চলেই অবতরণ করেছি।

—অ্যাঁ! তাহলে উপায়? সভয়ে মুলরাডি প্রশ্ন করে ওঠে।

—উপায়? প্যাগানেলের মুখে ফুটে উঠল করুণ হাসি, উপায় বুঝি একমাত্র পরমেশ্বরের কৃপা, করুণা ভাগ্য প্রসন্ন হলে মানে মানে বিদ্রোহী মাউরীদের এড়িয়ে যেতে পারব, নয়ত···নয়ত কি দারুণ দশা হবে তা আন্দাজ করে নাও।

লর্ড গ্লেনারভ্যান এতক্ষণে মুখ খুললেন আমাদের এমন ভাবে যেতে হবে যাতে করে ইংরেজ-সৈন্য ঘাঁটির কাছে তাড়াতাড়ি পৌছতে পারি।

প্যাগানেল মাথা নাড়ে। বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, লর্ড, সে আশা নেই। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এ অঞ্চলে স্বয়ং ইংরেজ সৈন্যরা পর্যন্ত আসতে সাহস পায় না। সেই দূরে অকল্যাণ্ডের কাছাকাছি গিয়ে হয়ত বা তাদের সাক্ষাৎ মিলতে পারে, তার আগে নয়।

—যাই হোক, জন ম্যাঙ্গলস্ প্রস্তাব করল, এখন আমাদের কাজ হবে যথা সম্ভব সমুদ্রউপকূল বরাবর উত্তর দিক পানে এগোনো।

—তা তো হবে, প্যাগনেল জবাব দেয়, তবে সব সময় তো আর সমুদ্রতীর ধরে যাওয়া সম্ভব হবে না। কারণ হল, অসংখ্য ছোট ছোট পর্বত উপকূলভূমিকে অগম্য করে রেখেছে। সে সব স্থানে ঘুরপথে বনের মধ্য দিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আরেকটি কথাও বিচার করতে হবে; উপকূল ধরে গেলে পথের দূরত্ব প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। দৈনিক দশ মাইল করে পথ হাটলে তবে আট নয় দিনে অকল্যাণ্ড পৌছতে সক্ষম হবো।

উপায় কি। তাই হোক। সে চেষ্টাই হোক দ্বিতীয় পথ তো নেই। সবাই এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

বৃষ্টিটা যেমন আকাশ ভেঙ্গে এসেছিল তেমনি এক সময় তার তীব্রতা কমে এল। ডাক গর্জন থামল। উপর্ঝস্তি ভাব কমল।

গভীর রাতে এক সময় বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশ পরিষ্কার, নির্মেঘ হয়ে উঠল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে প্রায় অন্ধকার থাকতে যাত্রা আরম্ভ করল দলটি।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। যাত্রার অল্পক্ষণ বাদেই পূব-আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠতে লাগলো।

এদিন কেমন যাবে কে জানে! ভালয় ভালয় কাটলে তবেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

পথের পুরোভাগে ছিল জন ম্যাঙ্গলস আর প্যাগানেল।

মাঝখানে মেয়েরা।

সবার শেষে মেজর।

খাবার-দাবার ও অন্যান্য জিনিষপত্তর সকলে ভাগাভাগি করে বয়ে নিয়ে চললো।

যতক্ষণ সমুদ্রতীর ধরে বালির ওপর দিয়ে পথ হাটতে লাগলো, ততক্ষণ খুব খারাপ লাগছিল না।

কিন্তু যখনই বনবাদাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছিল তখন দলটির বিশেষ করে মেয়েদের কষ্টের আর সীমা থাকছিল না।

অনেক পথ হাঁটা হয়ে গেল।

এ পর্যন্ত কোথাও কোন জনমানব আছে বলে মনে হচ্ছিল না। অন্তত কারুর সঙ্গেই চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয়নি।

তবু, সর্বক্ষণ একটা আতঙ্ক সন্ত্রস্ততা সবার মনেই খেলা করছিল, এই বুঝি ভয়াবহ ও সশস্ত্র মাউরীর দল বেরিয়ে আসে, এই বুঝি তারা তাদের হাতে বন্দী হয়, ওদের হাতে প্রাণ সংশয় হয়।

দলের পুরুষদের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই রিভলবার ছিল।

প্রায়শঃই ওরা চমকে উঠছিল। ঘস ঘস করে শব্দ হলেই চমকে থমকে থেমে যায় দলটি। কানখাড়া করে। না, কিছু নয়।

আবার ওরা পথ চলে।

চলতি পথ এড়িয়ে চলতে হয় পাছে অজানা শত্রুদের সঙ্গে আচমকা সাক্ষাৎ হয়ে যায়।

তাই চলতি পথ এড়িয়ে দুর্গম পথে যাওয়ার সময়ই দলটির কষ্টের মাত্রা বেড়ে যেতে লাগলো।

নিবিড় বন। নিশ্ছিদ্র ছায়ায় ঘেরা গহন অরণ্য। সূর্যের আলো প্রবেশ করে না এমন ঝোপজঙ্গল।

অনভ্যস্ত পদক্ষেপে সীমাহীন ক্লান্তি নিয়ে ওরা পথ হাঁটছে।

কাঁটালতা, ঝোপঝাড়ে পোষাক পরিচ্ছদ ছিঁড়ে যেতে লাগলো। গায়ের চামড়া ছিঁড়ে রক্ত ঝরতে লাগলো।

উপায় নেই। থামলে চলবে না। পথ চলতে হবেই। প্রাণ রাখতে প্রাণান্তকর ভ্রমণ।

শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন দৃঢ় পদক্ষেপে ওরা চলতে চেষ্টা করল দলটি।

কখনো বালুকাময় স্নিগ্ধ সমুদ্রতীরের মখমলসম পথ ধরে, কখনো রুক্ষ বন্ধুর পাহাড় পথে, কখনো বা অদ্ভুত সব কীট-পতঙ্গ ঘেরা গহীন অরণ্য দিয়ে।

কখনো পথে পড়ছে নয়ন মনোহর বিচিত্র সব ফুলে ভরা ঝোপ-ঝাড়ের রাজ্য, কখনো বা আগে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী।

কত ফুল, কত ফল, কত নাম-না-জানা অদ্ভুত সব গাছপালা।

অবাক চেহারার কতই না পাখী। যেমন রঙ তেমন আকৃতি, তেমনি বিচিত্র কলকাকলী।

## ॥ দশ ॥

পথ চলা, পথ চলা আর পথ চলা।

অবিরাম গতিতে ওরা পথ হাঁটতে লাগলো।

পথে সমুদ্রকূলে একবার কতগুলো চিংড়ি মাছ পাওয়া গেল।

বনভোজনের মত, পথে থেমে আগুন জ্বেলে চিংড়ি ভাজা করে ওরা আনন্দ করে খেল।

অদূরবর্তী ঝরণার সুমিষ্ট জল পান করে তৃষ্ণা নিবারিত হল সবার।

অতঃপর কিছুক্ষণের বিশ্রামান্তে ফের শুরু হয় পথ চলা।

সূর্য একদিক থেকে উঠে উঠে এক সময় মাথার ওপরে উঠে যায়, তারপর ক্রমে ক্রমে পশ্চিম দিকে নেমে অস্তাচলে ডুব দেয়।

কৃষ্ণবরণী সন্ধ্যা তার কালো রঙের বোরখা নিয়ে চরাচরকে অন্ধকারে ঢেকে ফেলে।

থামতে হয় দলটিকে। রাত্রে পথ চলা বিশেষ করে অজানা পথ চলা ভয়াবহ।

কোন একটা স্থান বেছে নিয়ে রাত্রি বাসের জায়গা ঠিক করে। পালটা পালটি করে একদল পাহারায় থাকে, বাদবাকিরা ঘুমোয়। মেয়েদের পাহারা দিতে হয় না, তারা ঘুমোয়।

রাত ভোর হলে আবার পথ চলা আরম্ভ হয়ে যায়।

এইভাবে এক দুই করে দিনের পর দিন কাটতে লাগলো।

পথ চলতে চলতে দু'একটা আশ্চর্য ব্যাপার নজরে এল।

দু'এক স্থানে পায়ের নিচেকার জমি বিস্ময়কর তপ্ত বলে মনে হল। মাটি গরম কেন?

কোন কোন স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণও দেখা গেল। টগবগ করা ফুটন্ত জল মাটি ভেদ করে ঊর্ধে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।

সেই প্রস্রবনের তপ্ত জল থেকে বের হচ্ছে বিকট গন্ধ।

উগ্র গন্ধকের গন্ধ।

এ দেশটা হল আগ্নেয়গিরির দেশ।

এখানকার প্রতিটি পাহাড়ই বলতে গেলে এক একটি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি।

নজরে পড়লো কোন কোন পাহাড় শীর্ষ থেকে সামান্য সামান্য ধোঁয়া এবং কিছু কিছু লাভাস্রোত নির্গত হচ্ছে।

দলটি চলতে থাকে। উপায় নেই চলতেই হবে। প্রাণের মায়া বড় মায়া। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ্।

সমুদ্র উপকূল দিয়ে যাবার সময় একবার এক যায়গায় ওরা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আবে! ওগুলো কিরে বাবা!

আবেকটুকু কাছে আসতে বোঝা গেল ওগুলো শীলমাছ।

শীলমাছগুলো ডাঙ্গায় উঠে সেখানে শুয়ে বোদ পোয়াচ্ছে।

কী বিরাট ওদের আকৃতি রে বাবা।

এক একটার মুখ দেখলে হাসি পায়। ইয়া বড় গোঁফ মুখে। লম্বায় এক একটা বিশাল চেহারায়। কম করেও পঁচিশ তিরিশ ফুটের কম হবে না।

—আবে তাজ্জব তো, রবার্ট অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, দেখ দেখ শীলমাছগুলো নুড়ি আর পাথরের টুকরো খাচ্ছে।

শুনে ভৌগোলিক প্যাগানেল স্মিত হাসলেন, বললেন ওগুলো ওরা খিদের জ্বালায় মোটেই খাচ্ছে না। পেট ভরানোর জন্যে মোটেই নয়, পেট ভার করবার জন্য নুড়ি খাচ্ছে।

—পেট ভার করবার জন্যে। সে আবার কি?

—সে বড় মজার ব্যাপার, ভৌগোলিক প্যাগানেল তেমনি হেসে বললেন, নুড়ি আর পাথর খেয়ে শরীরের ওজন বাড়াচ্ছে ওরা। কারণ? কারণ হল ওগুলো খেলে দেহের ওজন বাড়বে এবং তাতে

করে জলের তলায় তলিয়ে যেতে সুবিধে হবে। ভেসে ওঠবার প্রয়োজন হলে তখন ঐ নুড়ি আর পাথরের টুকরোগুলো উগরে ফেলে দেয়। বুঝলে এবার কায়দাটা?

—আশ্চর্য ব্যাপার তো?

—হ্যাঁ প্রকৃতি তার জীবদের নিজ নিজ সুবিধার্থে নানা প্রকার কায়দা শিখিয়ে দেয়।

এক সময় শীলমাছগুলো দেখা গেল তাদের প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সমুদ্রে নেমে ডুব দিল।

এর পর যাত্রীদলের পুনরায় হাঁটা শুরু হল।

বন জঙ্গল মাঠ ঘাট পাহাড় পর্বত সমুদ্র উপকূল এই একই দৃশ্য পুণঃ পৌনিক দশমিকের মত ঘুরে ফিরে আসতে লাগলো।

বেশ কিছু পথ অগ্রসর হবার পর সামনে দেখা দিল এক বিশালাকায় নদী।

ভৌগোলিক প্যাগানেল মানচিত্র বের করে দেখে জানালে এর নাম, ওয়াইপা।

মানচিত্রে দেখা গেল এই নদী যেখানে গিয়ে ওয়েইকাটু নামক অপর একটি নদীর সঙ্গে মিশেছে সেই সঙ্গমস্থল থেকে অকল্যাণ্ড খুব বেশী দূরে অবস্থিত নয়।

উক্ত দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে পৌঁছতে পারলেই দীর্ঘপথের বারো আনা অংশ অতিক্রম করা হবে।

মনে যেন জল এল। নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনায় সঞ্জীবীত হল যাত্রীদল। আরও কিছু কষ্ট, আরও কিঞ্চিৎ পরিশ্রম, ব্যস তাহলেই গন্তব্য স্থলের নিশ্চিন্ত আরামে পৌঁছনো যাবে।

কালো মেঘের পাড়ে যেন রূপালি রেখার ইঙ্গিৎ।

অদম্য উৎসাহ উদ্দীপনায় যাত্রীদল পা চালিয়ে চললো।

নদীর তীর ধরে ধরে যাওয়াতে কষ্টের কিছুটা লাঘব হল সন্দেহ নেই।

কিছুক্ষণ অক্লান্তভাবে চলে। আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়।

নদীর জলে স্নান সেরে ফলমূল খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে ফের ভ্রমণ শুরু করে।

লর্ড গ্লেনারভ্যান এক সময় মৃদু হেসে আস্বস্ত হয়ে বলে ওঠেন, ‘আমাদের বরাত বোধ করি ভালই হে! এখনও যখন হল না তখন ঐ জংলী মাউরীদের সঙ্গে আর হয়ত দেখা হবে না। বাঁচা গেল, কি বল?

—আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে লর্ড, সায় দিয়ে ওঠেন মেজর, দু'দশ মাইলের মধ্যে তো মনে হয় না যে কোন লোক বসতি আছে। ভালোয় ভালোয় এখন গিয়ে অকল্যাণ্ড পৌছতে পারলেই বাঁচা যায়। উঃ অসহ্য এ পথশ্রম।

অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিন্ত আরাম, বিপদের কোন আশংকা নেই, এই ধরণের আলাপ আলোচনায় সকলের মনেই যেন শান্তি ফিরে এল।

দুশ্চিন্তার মেঘ যেন দমকা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

মাউরী ভীতির তীব্রতা রইল না।

—উঃ, যাক বাবা, তাহলে আর নরখাদকের পাল্লায় পড়তে হল না।

—এ যাত্রা তাহলে প্রাণটা সবার বেঁচেই গেল মনে হচ্ছে।

বেলা গড়িয়ে এক সময় সন্ধ্যা তাঁর কালো আঁচল ছড়িয়ে দিল দিগবিদিকে।

একটা স্থান বেছে নিয়ে রাত্রির মত সামান্য আহার করে সবাই শুয়ে পড়ল।

অসীম ক্লান্তিতে অচিরেই সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

## ॥ এগারো ॥

পরদিন সকাল।

ওয়েইকাটু নদীর উপরকার ঘন কুয়াশা প্রভাত সূর্যের কিরণে ও মৃদুমন্দ বাতাসে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

বাতাসটি বেশ শ্রান্তিহারী মনে হচ্ছে।

কুয়াশা কেটে যাবার পর এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখা গেল।

দেখা গেল, নদীর উপর দিয়ে এককাঠে তৈরী একটা শালতি নৌকো তরতর করে ক্ষিপ্রগতিতে জল কেটে বয়ে চলেছে। ২৫'×৫'

শালতি নৌকোর দৈর্ঘ হবে প্রায় পঁচিশ ফুট আর চওড়া হবে পুরো পাঁচ ফুট।

আট নয় জন ইয়া-জোয়ান জংলী মানুষ প্রচণ্ড বিক্রমে দাঁড় টেনে চলেছে।

হাল ধরে বসে আছে একজন ভীষণাকৃতি মাউরী।

এই হাল ধারকের পোষাক-পরিচ্ছদ, কানের কিম্ভূতকিমাকৃতির গহনা কণ্ঠের রঙিন পাথরের মালা, কপালে লম্বা লম্বা শুকনো ক্ষতচিহ্ন এবং সর্বাঙ্গে বিচিত্র সব, উল্কির দাগ দেখেই বোঝা যায় লোকটা সাধারণ কেউ নয়, অবশ্যই কোনো সর্দার।

যেমন বলিষ্ঠ তার গড়ন, তেমনি শক্তিশালী তার দেহখানা।

আর সবার উপরে স্বয়ং যখন হাল ধরে বসে আছে তখন ইনি যে একজন খুবই উঁচুদরের সর্দার সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

সর্দারের বাঁ কাঁধে ঝোলানো একটি বিলিতি বন্দুক, কোমরের ডান পাশে ঝোলানো তীক্ষ্ণধার এক কুঠার।

সর্দারের সামনে শালতির মধ্যে বসে রয়েছে দশজন ভীম-দর্শন মানুষ। পোষাক-আশাক কায়দা কানুন দেখে মনে হয় সৈনিক।

তাদের শরীরের নানাস্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রক্তাক্ত

আঘাত। অধিকাংশ আঘাত স্থান লতাপাতা দিয়ে বাঁধা। তারই ফাঁকে কোন কোনটা থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরছে দেখা গেল।

পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল নিথর নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে সেই ভীমাকৃতি মানুষগুলো।

সর্দারের পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে তিন তিনটে করাল দর্শন হিংস্র স্বভাবের কুকুর।

যারা দাঁড় টেনে চলেছে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে তারা অবশ্যই সর্দারের বান্দা, ভৃত্য অর্থাৎ ক্রীতদাস।

এ পর্যন্ত বিস্ময়ের কিছু নয়। বিস্ময়ের ব্যাপাব হল সেই নৌকোর মধ্যে ঠিক মাঝখান বরাবব বসে রয়েছে একদল ইংরেজ বন্দী।

তাদের প্রত্যেকেব পাগুলো লতাপাতা দিয়ে কঠিন বন্ধনে বাঁধা রয়েছে।

আর অবাক কাণ্ড এদের আমবা চিনি। এবা হল আমাদেব সেই পূর্ব পরিচিত অকল্যাণ্ডগামী শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদল।

অর্থাৎ সেই জাহাজডুবি হওয়া লর্ড গ্লেনারভ্যান, লেডি হেলেনা, মেরী, রবার্ট, জনম্যাঙ্গলস, প্যাগানেল প্রভৃতি।

ওরা এ পরিবেশে এল কি কবে? নেহাৎ অদৃষ্টের পরিহাসই বলতে হবে।

গতরাত্রে ওরা যখন ভেবে আশ্বস্ত হয়েছিল যে 'যাক মাউরীদের ভয় কেটে গেছে' এবং সেই শুভ চিন্তায়, নিশ্চিন্তে সবাই যখন অঘোর ঘুমে মগ্ন, ঠিক সেই সময় শেষ রাত নাগাদ মাউরীরা এসে ওদেব আচমকা বন্দী করে ফেলে।

বাত্রির অন্ধকারে ওরা আদৌ বুঝতে পারেনি যে যেখানে এসে ওরা রাত্রিবাস করছিল, তারই অদূরে পড়েছে মাউরী সৈনিকদের সাময়িক ছাউনী।

ঘুমন্ত অবস্থায় এই মাউরী সৈন্যরা চুপিসারে এসে ওদের বন্দী এবং ওদের যাবতীয় আগ্নেয়াস্ত্রগুলি কেড়ে নেয়।

অবশ্য সুখের কথা, কোন প্রকার খারাপ ব্যবহার ওদের সঙ্গে করেনি এই জংলীরা।

শুধুমাত্র ওদের বন্দী করে ধরে নিয়ে তুলেছে শালতি নৌকোর মধ্যে, তারপর দীর্ঘ ও সাংঘাতিক শক্ত একপ্রকার লতা দিয়ে প্রত্যেকের পা বেঁধে দিয়েছে।

তারপর সেই অদ্ভুত রাত্রিও এক সময় কেটে গিয়ে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে।

ভোর হতেই শুরু হয়েছে অজানা স্থানের উদ্দেশ্যে নৌকো যাত্রা।

নিরস্ত্র এবং সম্পূর্ণরূপে অসহায় ইংরেজ বন্দীরা একান্তভাবে ভবিতব্যের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে চুপচাপ বসেছিল।

এক-কাঠের শালতি নৌকো অতি দ্রুতগতিতে তরতর করে বয়ে যাচ্ছিল নদীর বুকের জল কেটে।

মাউরীদের নিজস্ব জংলী ভাষায় বলা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার মাঝে কিছু কিছু ইংরিজি শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

সেইসব উচ্চারিত শব্দ থেকে বোঝা গেল যে এই মাউরীদের সর্দার তার দলবল নিয়ে স্থানীয় ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল।

যুদ্ধে যথারীতি পরাজিত এবং জখম হয়ে আহত কিছু সৈনিকসহ সর্দার ফিরে চলেছে নিজেদের আস্তানায়, নিজেদের ঘাঁটিতে।

সেখান থেকে পুনরায় নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে নতুন উদ্যমে ফিরে যাবে পূর্বোল্লিখিত উইলিয়ম টমসনের নেতৃত্বে যুদ্ধক্ষেত্রে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে।

এই সর্দারটির নাম, কৈকউমউ।

জংলী ভাষায় যার অর্থ হল: "যে মানুষ শত্রুদের ঠ্যাং খেতে ভালবাসে।"

এই সর্দার মানুষটি শুধুমাত্র যে অতীব বলশালী তা-ই নয়, উপরন্তু

স্বভাবে অতীব হিংস্র এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষও বটে। এর দেহের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে দয়ামায়া বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব একেবারেই বুঝি নেই।

সর্দার কৈকউমউ !!

এই নামটি শ্রবণমাত্র ইংরেজ সৈন্যরাও পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে ওঠে।

এই সর্দারটি এত ভয়ংকর দানব যে নিউজিল্যাণ্ডের গভর্নর ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন :

"যে এই কৈকউমউ সর্দারের মাথা কেটে আনতে সক্ষম হবে তাকে প্রভূত পরিমাণের পুরস্কার দেওয়া হবে।"

অতএব দুর্ভাগ্য এই ইংরেজ দলটির। এই দানবসদৃশ সর্দারের খপ্পরে যখন পড়া গেছে তখন বুঝি আর পরিত্রাণের পথ নেই।

পরিণাম? পরিণামে যে মৃত্যু অবধারিত এ বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ কোথায়?

সাতঙ্ক চিত্তে ইংরেজ বন্দীগণ ভাবছিল। আর ভাবতে ভাবতে পোষাকের অন্তরালে ঘেমে উঠছিল। আতঙ্কে সর্বাঙ্গ তাঁদের শিউরে শিউরে উঠছিল।

উঃ! হায় ঈশ্বর! কী ভীষণ মৃত্যুই না ঘটবে এই নিষ্ঠুর হিংস্র নরখাদক সর্দারের হাতে।

গড! কে জানে হয়ত জ্যান্ত অবস্থাতেই ওদের কড়মড় করে কামড়ে কামড়ে খাবে মাউরীগুলো।?

মনে মনে সাংঘাতিক ভয় পেলেও বাইরে কিন্তু তা প্রকাশ করতে দিল না ইংরেজ বন্দীগণ।

একটা অদ্ভুত উদাসীন ভাব বজায় রেখে চুপ চাপ তাঁরা বসেছিলেন নৌকোর মধ্যে পদদ্বয় লতাপাতা দিয়ে বাঁধা অবস্থায়।

কেউ কোন কথা বলছিল না। শুধু মাত্র জলের মধ্যে বেয়ে যাওয়া বৈঠার ছপছপ শব্দ ছাড়া কারুর মুখে কোন 'রা' ছিল না।

## ॥ বারো ॥

এইভাবে বহুক্ষণ কেটে যাবার পর বন্দী লর্ড গ্লেনারভ্যান সর্দারের পানে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব শান্ত ও কোমল গলায় জিগ্যেস করলেন, আমাদের তুমি কোথায় নিয়ে চলেছ সর্দার?

কৈকউমউ ভয়ংকর দৃষ্টিতে শুধুমাত্র তাকালো, সর্দার কিন্তু মুখে কোন উত্তর প্রদান করল না।

—আমাদের নিয়ে গিয়ে তুমি কি করবে সর্দার? লর্ড গ্লেনারভ্যান পুনরায় প্রশ্ন কবেন।

এবার মুখ খুললো সর্দার কৈকউমউ।

বিদ্যুৎভরা অগ্নিদৃষ্টি হেনে সর্দার এবার বাজখাই কণ্ঠে বলে ওঠে, কি করবো তোমাদের নিয়ে? তাহলে শোন, যদি তোমাদের 'বজ্জাত স্বজাতি ইংরেজরা' বন্দী 'বদল করতে রাজি থাকে তাহলে তোমাদের তাদের হাতে ফিবিয়ে দেব। আর তারা যদি তাতে রাজি না হয়, সর্দার কৈকউমউ এবার দাঁত কড়মড় করে বিকৃত মুখে সক্রোধে উচ্চারণ করল, তাহলে, তাহলে তোদের আমি একজন একজন করে হত্যা করব, বুঝলে?

একথা শোনবার পর সবারই রক্ত হিম হয়ে এল। আর কোন প্রশ্ন করবার প্রবৃত্তি হল না লর্ড গ্লেনারভ্যানের। উঃ গড!

এ কথায় বোঝা গেল যে ইংরেজদের হাতে এই মাউরীদের অনেক সৈন্য এবং সর্দার বন্দী হয়ে গেছে। সেই সব বন্দীদের সঙ্গেই এই ইংরেজ বন্দীদের বদল করতে চাইছে।

'ওয়াইকাটু!

মাউরীদের একটি অতীব গর্বের নদী হল এই ওয়াই কাটু।

একদিকে এই প্রাণোচ্ছলা নদী হল প্রদেশের প্রাণ প্রবাহিকা অপর দিকে এটি একটি দুর্ভেদ্য সীমান্তরেখা বিশেষও। এমনটি

কোন বিদেশী আজ পর্যন্ত এই নদীর অপর পাড়ে এগোতে সাহস করেনি।

নদীর এপাড় থেকেই মাউরীরা তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে।

শালতি নৌকো চলেছে তরতরিয়ে, অবিরাম গতিতে। ঝপাং ঝপাং শব্দে একঘেয়ে ভাবে দাঁড় চলেছে জল কেটে কেটে।

কিন্তু কোথায় নিয়ে চলেছে এই শ্বেতাঙ্গ বন্দীদলকে মাউরীরা?

জংলীদের কথাবার্তায় মাঝে মাঝেই একটি শব্দে উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছিল—সেটি হল, 'টাইপু'।

ভৌগোলিক প্যাগানেল মানচিত্র খুলে দেখালো, 'টাইপু' হল একটি বিরাট হ্রদের নাম। সে হ্রদটি এখান থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে অবস্থিত।

তাহলে কি সেইখানেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের? হয়ত তাই। এখনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সারাটা দিন ধরে অবিশ্রান্ত ভাবে নৌকো চললো।

সন্ধ্যাব প্রাক্কালে একটা স্থানে শালতি ভিড়লো। মাউরী সৈন্যরা ইংরেজ বন্দীদের ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে এক স্থানে বসালো।

তারপর তাদের ঘিরে চারদিকে দূরে দূরে আগুন জ্বেলে দিল। অবশেষে তারা কড়া নজরে শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের পাহারা দিতে লাগলো।

আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় আরেক দল সর্দারের জন্য লতাপাতার ছাউনী তৈরী করে ফেললো।

এইভাবে আরেকটি দুঃসহ রাত ভোর হয়ে গেল।

রাত শেষ হলে পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু হল।

গতরাত্রে ইংরেজ বন্দীদের কি একটা বিশ্রী অখাদ্য আকৃতির পোড়া মাংস খেতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজ বন্দীরা ভয়ে আতঙ্কে ঘৃণায় স্পর্শও করে নি।

কে জানে বাবা ওগুলো কোন নরমাংস কিনা।

সেদিন কাটলো। সে সন্ধ্যায় পাশের এক উপনদী থেকে আরেকটা শালতি নৌকো এসে যোগ দিল ওদের সঙ্গে।

সেই শালতি নৌকোর মধ্যেও দেখা গেল ভরতি রয়েছে বহু আহত সৈন্য এবং একজন সর্দার।

দুটি নৌকো এক সময় মিলিত হল।

অতঃপর সেই দ্বিতীয় নৌকোর সর্দার এসে ওদের জংলী প্রথায় কৈকউমউ-এর সঙ্গে নাক ঘষাঘষি করে অভিবাদন করলে। তারপর অবোধ্য ভাষায় কি সব কথাবার্তা হল উভয়ের মধ্যে।

সন্ধ্যায় তীরে নামলো সবাই।

দুই সর্দারে খানা পিনা করে শুতে গেল।

এবার বন্দীদের কিছু ফল মূল দেওয়া হল নৈশাহারের জন্য। তবু কিছু মুখে দেওয়া গেল এবার।

এই ভাবে দিনের পর দিন কাটতে লাগলো।

ইতিমধ্যে শাখানদী ও উপনদী থেকে পর পর কয়েকটা নৌকো এসে মিলিত হল ওদের সঙ্গে।

সবগুলো শালতিই আহত মাউরী সৈন্যে ভরা।

ওয়াই কাটু নদীর বুকে এক ঝাঁক শালতি চলেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন বিরাট এক নৌবাহিনী চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রে।

সমস্ত নৌকো থেকে সমস্ত মাউরীরা বিকট কণ্ঠে সমবেত ভাবে গাইছিল ওদের জাতীয় সঙ্গীত 'পীহে'।

গানটা হল ঃ

—পা পা রা টি ওয়াটি টি ডি
আই ডাউঙ্গা নেই—ইত্যাদি

সমবেত কণ্ঠের বিকট সেই গান আশে পাশের পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা আরও যেন ভয়াবহ করে তুলতে লাগলো।

সেই একই ধরণ। রাত্রে যাত্রা বিরতি, দিনে ফের নৌকো চালনা।

কয়েক দিন এই ভাবে চললো। শ্বেতাঙ্গ বন্দী দলের অবস্থা কহতব্য নয়। তারা যেন জীবন্মৃতের মত চুপচাপ বসে ছিল।

এরপর এক সময় একস্থানে বিস্ময়কর এক দৃশ্য নজরে পড়লো ইংরেজ বন্দীদলের। অভূতপূর্ব দৃশ্য। ইতিপূর্বে এধরণের দৃশ্য ওরা কেউ দেখেনি।

দৃশ্যটা হল ঃ নদীর প্রায় মাইল দুয়েক স্থান জুড়ে নদী যেন টগবগ করে ফুটছে। আশ্চর্য কাণ্ড, জলের গরমে সেদ্ধ হবার যোগাড়।

গরম বাষ্প উঠছে নদী থেকে। সেই ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন।

এমন কি নদীর পাড়ের কাছের আধাতরল কাদা গুলো পর্যন্ত ফট ফট করে ফুটছে।

সেখানে পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই।

বোধকরি নিকটবর্তী কোন আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা স্রোত এসে নদীর জলকে এখানে এতটা উত্তপ্ত করে তুলেছে।

তার উপরে নৌকো চলেছে। ভয়াবহ পরিস্থিতি।

গন্ধকের তীব্র গন্ধে সবার নাক জ্বালা করতে লাগলো।

অদ্ভুত ব্যাপার শ্বেতাঙ্গ বন্দীদল দিশেহারার মত বসে রইল।

এই ধরণের অসহনীয় পথে দু'মাইল চলবার পর ফের এক সময় জল ঠাণ্ডা দেখা দিল। এবার ফের ঠাণ্ডা নদী, ঠাণ্ডা জল।

রাতের পর দিন, তারপর রাত, তারও পরে আবার দিন। এই ভাবে ছ'দিনের দিন দেখা দিল সেই পূর্বোক্ত হ্রদ—টাইপু।

বেশ বড় আকারের হ্রদ।

হ্রদের ডানপাশে বিরাট পর্বতমালা পাড় ঘেঁসেই উঠে গেছে আকাশ পানে। মাইলের পর মাইল লম্বা পর্বত শ্রেণী।

সেই পাহাড়ের গায়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে দেখা গেল কতগুলো কুটির রয়েছে। মাঝখানে কুটিরগুলো, আর তার চারদিক ঘেরা প্রাচীর।

ঐ প্রাচীর ঘেরা কুটির সমূহই হল এই সব সর্দারদের তথাকথিত দুর্গ।

## ॥ তেরো ॥

মাউরীদের নিজস্ব ভাষায় দুর্গকে বলে : পাহ্।

এই পাহ্-এর ওপর একটা লম্বা গাছের মাথায় লক্ষ্য করা গেল একটি রঙিন কাপড় উড়ছে।

ওটা হল এদের জাতীয় পতাকা।

অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৌকাস্থ মাউরীরা ঐ পতাকাটিকে অভিবাদন জানালো।

সূর্য প্রায় ডোবে ডোবে।

এমন সময় নৌকো গিয়ে লেকের তীরে ভিড়লো।

কড়া পাহারায়, প্রথমে বন্দীদের পায়ের বাঁধন খুলে, তারপর লাইন করিয়ে দুর্গম চড়াই পথে পাহাড়ের উপর সেই দুর্গের দিকে নিয়ে যাওয়া হল।

শরীর-মন যেন অসার হয়ে গেছে শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের। চলতে হয় চলছে, না চলে উপায় নেই, এইভাবে ইংরেজ নরনারীগণ চড়াই পথ ভেঙ্গে উপর দিকে উঠতে লাগলো।

ঠাণ্ডা হাওয়াতেও তাদের নাকে মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিতে লাগল।

কতক্ষণ পথ ভেঙ্গেছে কে জানে। অবশেষে এক সময় ক্লান্তিকর পাহাড়ে পথ দিয়ে অবশেষে ওরা এসে পৌঁছলো পাহ্ বা দুর্গের প্রাচীরাভ্যন্তরে।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লতাপাতা নির্মিত কতগুলো কুটীরের দ্বারা এই 'পাহ্' গঠিত।

এই আস্তানাসমূহের চারদিক তিন সারি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

দূর থেকে বোঝা যায় নি, ভেতরে এসে দেখা গেল দুর্গকে

সুরক্ষিত করবার জন্যে একটি নয় দুটি নয় তিন তিনটে পাঁচীল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। প্রথমে প্রায় পনের ফুট উঁচু পাথরের দেওয়াল।

তার ভেতরের দ্বিতীয় দেওয়াল হল কাঠ ও খুঁটির তৈরী।

তৃতীয় দেওয়াল তৈরী বেশ পুরু মাটির দ্বারা।

এক প্রাচীরের বেষ্টনী থেকে অন্য প্রাচীরের বেষ্টনীতে ঢোকবার মাত্র একটি করে দরজা বা গেট। সে গেটও খুব সুরক্ষিত, কড়া পাহারাদার সেখানে দিবারাত্র পাহারা দিয়ে চলেছে।

ভেতরে ঢুকে ইংরেজ বন্দীরা যে দৃশ্য দেখলো তাতে নিমেষে তাদের রক্ত জল হয়ে গেল।

ভয়াবহ দৃশ্য।

আতঙ্কে তারা দেখলো গেট দিয়ে ঢুকে ডাইনে-বাঁয়ে পাথরের থরে থরে ঝোলানো রয়েছে সব মানুষের গলা অবধি কাটা মুণ্ড।

এই অমানুষিক দৃশ্য দেখে লেডি হেলেনা ও মেরী ভয়ে চোখ ঢাকলো।

এগুলো কাদের মাথা?

এগুলো হল মাউরীদের যুদ্ধ-বন্দীদের কেটে রাখা মাথা।

কয়েকটি মুণ্ডু দেখা গেল শ্বেতকায় জাতির।

অবশ্যই ইংরেজদের মাথা সেগুলো।

সেইসব কাটা-মুণ্ডুগুলো থেকে তাদের চোখগুলোকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে।

মাথার ঘিলু বের করে নেওয়া হয়েছে।

মুখের সমস্ত চামড়াই ছাড়ানো।

অতঃপর মাউরীরা তাদের নিজস্ব এক আশ্চর্য প্রক্রিয়ার মারফৎ, কি এক বস্তুর ধোঁয়ার সাহায্যে ওগুলোকে প্রায় 'মমি'র মত চিরস্থায়ী করে প্রাচীরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

এটা বুঝি ওদের রীতি, ওদের লোকাচার, ওদের দেশাচার।

এর মধ্যে একটি কুটীর একটু বিশিষ্ট ধরণে তৈরী দেখা গেল। সেটা সর্দার কৈ-কউমউ-এর ঘর।

বিচিত্র সব লতাপাতা আর সুন্দর সুন্দর ফুলের দ্বারা পরিপাটি করে সাজানো সেই কুটীর।

কুটীরগুলির ফাঁকে ফাঁকে প্রশস্ত উঠোন।

ইংরেজ বন্দীদের নিয়ে ঢোকানো হল পাহাড়ের গায়ে লাগানো সব শেষের একটি কুটিরে।

সে কুটিরে রয়েছে একটি মাত্র দরজা। সেই দরজার সামনে পাতায় বোনা একটা মাতুরের মত ঝুলছে, অনেকটা পর্দার মত।

বাইরে কজন জংলীর সতর্ক পাহারা বসে গেল।

কুটিরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ইংরেজরা দেখলো অনেকটা দূরে সর্দার কৈ-কউমউকে ঘিরে একশ'র মত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার এক জনতা উত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন সব কথাবার্তা বলছে, চেঁচামেচি করছে।

পরে বোঝা গেল ব্যাপারটা।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সর্দার সবে ফিরে এসেছে।

তার মুখে যুদ্ধের এবং হতাহতের সংবাদ শুনে মৃত সৈনিকদের আত্মীয়-পরিজনেরা অকথ্য চিৎকার এবং শোকাচ্ছন্ন কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে।

মাউরীদের শোক প্রকাশের ধরণও বড় বিচিত্র।

আত্মীয় বিয়োগের সংবাদ শুনে মেয়েগুলো তীক্ষ্ণধার প্রস্তর খণ্ড দিয়ে নিজেদের হাত-পা-নাক-মুখ-কপাল প্রভৃতি চিরে ফেলছে আর হাউমাউ করে ভীষণ কান্না কাঁদছে।

'দেহের বিভিন্ন ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

এই প্রকারের বীভৎস দৃশ্য আর অশ্রাব্য ও অবোধ্য বিলাপের বাণীতে স্থানটা যেন নরকতুল্য হয়ে উঠেছে।

এ অভাবনীয় ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ইংরেজ বন্দীদের ধড়ে আর প্রাণ রইল না।

প্রতি মুহূর্তে তারা আশংকা করতে লাগলো, এই বুঝিবা শোকাকুল আর ক্রুদ্ধ জনতা তাদের আক্রমণ করে জীবন্ত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলে।

জনতা সর্দারকে ঘিরে কান্নাকাটি করছে, উত্তেজিত ভাবে অবিরাম কি সব যেন বলে যাচ্ছে।

সর্দার কৈ-কউমউ প্রচণ্ডভাবে হাত মুখ নেড়ে জনতাকে কি যেন সব বোঝাবার চেষ্টা করছে।

জনতা সর্দারের কথা শুনছে আর মাঝে মাঝে ইংরেজ বন্দীদের কুটিরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে জনতা যেন ক্রমে অধৈর্য এবং উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

অজানা অজ্ঞাত নিদারুণ আতঙ্কে লেডি হেলেনা আর মেরী কাঁদতে শুরু করলো।

লর্ড গ্লেনারভ্যান তাদের দুজনকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, ভয় কোরো না, অধীর হ'য়ো না। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখো। মনে শান্তি পাবে তাহলে, বলও পাবে।

লেডি হেলেনা কাঁদতে লাগলেন।

এক সময় কাঁদতে কাঁদতেই তিনি পোষাকের ভেতরে লুক্কায়িত একটা রিভলবার বার করে আন্‌লেন।

ব্যাপার দেখে লর্ড তো অবাক!

লেডি হেলেনা রিভলবারটি লর্ডের হাতে দিয়ে বললেন, এটা আমি লুকিয়ে রাখতে পেরেছি।

—কি ভাবে সম্ভব হল?

—মাউরীরা আমায় সেদিন তল্লাসী করে নি। তাই লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল। শোন জীবনের চেয়ে মান ইজ্জতের দাম অনেক বেশী। যদি এই অসভ্য জংলীরা আমাদের অসম্মান করতে এগিয়ে আসে তো আমাদের সম্মান হানির পূর্বেই তুমি এই

অস্ত্র দিয়ে আমাকে এবং মেরীকে মেরে ফেলবে। সে মৃত্যু আমাদের মোটেই দুঃখের হবে না, অগৌরবের হবে না।

—না না না, লর্ড গ্লেনারভ্যান মাথা নাড়লেন, ওসব বাজে চিন্তা তুমি আদৌ ক'রো না হেলেনা। তারপর হেলেনার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গাঢ় স্বরে বললেন, অলক্ষুণে চিন্তা মোটেই করবে না, মনে সাহস সঞ্চয় করো। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখো। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি সর্বক্ষণ আমাদের সঙ্গেই আছেন।

এমন সময় বিকট আকৃতির কজন মাউরী সৈন্য এসে ওদের কাছে দাঁড়ালো।

তারপর ঈঙ্গিত করলো তাদের অনুসরণ করবার।

সবাইকে যেতে হবে। বাইরে যেতে হবে। সর্দার ডাকছেন।

চমকে উঠলো সবাই। ধক্ করে উঠল বুক।

ডাকছে? ডাকছে কেনরে বাবা। ব্যাপার কি? আবার কোন ফ্যাচাং হল।

কিন্তু এসব ওরা মুখ ফুটে প্রশ্ন করল না। শুধু প্রত্যেকে প্রত্যেকের পানে জিজ্ঞাসুভাবে তাকালো।

প্রশ্ন করলেও অবশ্য উত্তর দেবে কি?

প্রহরীদের পাথরের মত ভাবলেশহীন মুখে এ প্রশ্নের কোন জবাব আশা করা বৃথা। পাওয়াও গেল না।

মৃদুমন্দ পায়ে শ্বেতাঙ্গ দলটি প্রহরীদের পেছন পেছন এগিয়ে চললো, ভয়াবহ সেই সর্দার যেখানে আছে সেই দিকে।

অজ্ঞাত আশংকায় বুক দুর দুর করতে লাগলো সবার। এক্ষুনি প্রাণে মেরে ফেলবে নাকি?

মেয়েদের চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে।

পুরুষদের থমথমে সাংঘাতিক গম্ভীর মুখ।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল তারা।

## ॥ চৌদ্দ ॥

সর্দার কৈ-কউমউ রাজকীয় ভাবে বসেছিল একটা বিচিত্র সাজে সজ্জিত কাঠের গুড়ির আসনে।

শ্বেতাঙ্গ বন্দীদলকে সেখানে হাজির করা হল।

দেখা গেল জনতা তখনকার মতো বিদায় নিয়েছে।

কৈ-কউমউ উপবিষ্ঠ আর পাশে দাঁড়ানো রয়েছে সেই পথে আসা নৌকোর অপর সর্দারটি।

সে সর্দারের নাম ঃ কারাটেটি।

আরও ভীষণ তার আকৃতি  তাকে দেখলেই মানুষের কথা মনে হয় না, মনে হয় কোন এক অতি হিংস্র জানোয়ার।

আজ যদিও এই দুজন সর্দার একসঙ্গে মিলিত হয়েছে, আদপে এরা কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পারে না। এদের মধ্যে আদৌ সদ্ভাব নেই। নেতৃত্ব নিয়ে দুজনের মধ্যে সম্প্রতি খুবই রেষারেষি চলছে।

শ্বেতাঙ্গ বন্দীদল সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সর্দার কৈ-কউমউ বাজখাই গলায় লর্ড গ্লেনারভ্যানের পানে রক্তচক্ষু সহকারে তাকিয়ে বলে ওঠে, তোমরা তো ইংরেজ, তাই না?

—হ্যাঁ আমরা ইংরেজ, লর্ড মাথা নেড়ে জবাব দেন, আমরা জাহাজডুবি হয়ে এখানে এসে উঠেছি। যুদ্ধের সঙ্গে বিশ্বাস করুন আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

—তা হোক, যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্ক থাক আর না-ই থাক, তোমরা জাতে তো ইংরেজ, রক্তচক্ষু কারাটেটি এবার দাঁত কিড়মিড় করে খেঁকিয়ে উঠল, সমস্ত ইংরেজ জাতই আমাদের পাকা দুশমন। আমাদের দেশকে তোমরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছ।

লর্ড মাথা নাড়লেন, আন্তরিক সায় দিয়ে বললেন, ঠিক বলেছেন,

আমি মানছি একাজ অন্যায়, এ কাজের ব্যাপারে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের এ দলের কারুরই সায় নেই।

—ন্যাকামি রাখো, কৈ-কউমউ কর্কশ স্বরে চিৎকার করে ওঠে, সব ইংরেজই সমান। শোন, আমাদের প্রধান পুরোহিত টহোঙ্গা তোমাদের ঐ ঘৃণ্য জাতের হাতে বন্দী হয়েছেন। সে সংবাদ শোনবার পর থেকে আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রোধে দাউদাউ করে জ্বলছে। ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে তার প্রতিশোধ নিই তোমাদের উপর। ইচ্ছে করছে তোমাদের এক্ষুনি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি।

সর্দারের বিশাল দেহ প্রকৃতই অদম্য ক্রোধে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো।

ফোঁসফাঁস ভোঁসভাস করে সে ক্রোধকে বুঝি অতিকষ্টে কিছুটা প্রশমিত করল, তারপর লর্ডের দিকে তাকিয়ে ফের বললে, শোন; আমাদের পুরোহিতকে যদি ওরা ছেড়ে দেয়, তাকে যদি ফের আমাদের মধ্যে ফিরে পাই, তবেই তোমাদের আমরা ছেড়ে দিতে পারি ফিরিয়ে দিতে পারি। বলো, এ প্রস্তাবে রাজী তোমাদের জাত?

—এ প্রশ্ন আমায় করা বৃথা, লর্ড গ্লেনারভ্যান সরল মনে সাদা উত্তর দিলেন, রাজী হবে কিনা আমি কি করে বলবো বল সর্দার?

—এ প্রশ্ন আমায় করা বৃথা, অবিকল লর্ডের গলায় ভেংচে ওঠে সর্দার কৈ-কউমউ, ন্যাকা ইংরেজ কোথাকার।

এবার সর্দারের চেহারা ফের পালটে ভয়ংকর হয়ে উঠল, কম্পিত দেহে কম্পিত কণ্ঠে সর্দার বলে ওঠে, তবে শুনে রাখ্......

সর্দার অসহ্য ক্রোধে এবার 'তুমি' থেকে 'তুই' এ নাবলো, যদি তোদের জাত রাজী না হয় তাহলে তোদের মুণ্ডুও ঐ রকম ভাবে দেয়ালে ঝুলতে থাকবে।

এই বলে দেয়ালে সারি সারি গলাকাটা মুণ্ডুগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালো।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো।

কারাটেটি নামক সর্দারটি সহসা এসে লেডি হেলেনার হাত টেনে ধরে বলে উঠলো, এটাকে আমি বিয়ে করব।

তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল বন্দীরা।

এতটুকু দেরী হল না লক্ষ্যস্থির করতে। চোখের নিমেষে লর্ড গ্লেনারভ্যান রিভলবার বার করে ট্রিগার টিপলেন।

গুড়ুম !!

এক গুলিতেই খতম করে দিলেন কারাটেটিকে।

তার বিপুলদেহ প্রাণহীন হয়ে ধপাস শব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

বুকের মাঝখান থেকে ক্ষতস্থান উপচে গলগল করে টাটকা রক্ত ঝরতে লাগলো। রক্তে স্থানটা ভেসে যেতে লাগলো।

এদিকে গুলির আওয়াজ শুনে চারদিকে থেকে সশস্ত্র বহু জংলী দৌড়ে এল ওদের কাছে, মারমুখী হয়ে, ভয়ংকর জিঘাংসা নিয়ে।

মুহূর্তে বুঝি ওদের মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। হাতে তাদের মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র।

দাঁত কিড়মিড় করে হুঙ্কার ছেড়ে সবাই প্রচণ্ড ক্রোধে শ্বেতাঙ্গ বন্দীদলকে আক্রমণ করতে উদ্যত হতেই সর্দার দু'হাত তুলে সবাইকে নিরস্ত করলো। কৈ-কউমউএর বজ্রকণ্ঠ সমস্ত কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠলো। শোনা গেল সে বলছে ঃ

টেবু ! টেবু !! টেবু !!!

এই দু অক্ষরের কথায় যেন মন্ত্রের মত কাজ হয়ে গেল। কি যাদু আছে এ শব্দটিতে ?

মারমুখী হিংস্র জনতা নিমেষে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

যেন বিধাতার অমোঘ নির্দেশে সবাই চুপ হয়ে গেল। উদ্যত হাত অস্ত্রসহ নামিয়ে আনলো।

সর্দারের নির্দেশে কয়েকজন সৈন্য এগিয়ে এসে গ্রেনারভ্যানের হাত থেকে রিভলবারটা কেড়ে নিল।

তারপর জংলী সৈন্যরা শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের ধরে নিয়ে সশস্ত্র পাহারায় তাদের পূর্বোক্ত কুটীরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখলো।

একটি আশ্চর্যের বিষয় অবশ্য জংলীরা বুঝি লক্ষ্য করল না।

এ শ্বেতাঙ্গ বন্দীদলে কিন্তু এর পর রবার্ট বা প্যাগানেল দুজনের একজনকেও দেখা গেল না।

গেল কোথায় ওরা ?

দেখা যাক।

॥ পনের ॥

টেবু!

টেবু কথাটি মাউরীদের কাছে একটি ঐশ্বরিক আজ্ঞার মত ধরা হয়ে থাকে।

টেবু!!

মন্ত্রপুত শব্দ যেন। অলৌকিক ক্ষমতা এই ক্ষুদ্র শব্দটির।

এ শব্দটির উচ্চারণ করবার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র ওদের রাজা, সর্দার বা পুরোহিতের।

এটাকে সর্বদাই অলৌকিক, দৈবিক শক্তির আদেশ বলেই মনে করা হয়।

যাকে বা যার সম্বন্ধে 'টেবু' শব্দটি উচ্চারিত হয় তাকে বা তাদের আঘাত করা কিংবা অনিষ্ট করা অলজ্ঘনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়।

টেবু-প্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ নিরাপদে রক্ষিত হয়ে থাকে।

নানা বিচিত্র ক্ষেত্রেই ওরা এই টেবু-র দ্বারা শাসিত হয়।

সেদিনও ঐই টেবু-র অলৌকিক মাহাত্মে ইংরেজ বন্দীরা জংলী জনতার উন্মত্ত ক্রোধ থেকে আপাতত বেঁচে গেল।

সে রাত ওদের কাছে বিষাক্ত রাত। সেই দুঃসহ রাত যেভাবে কাটলো তা অবর্ণনীয়।

লর্ড গ্লেনারভ্যান বুঝতে পারলেন তাঁর মৃত্যু এবার অনিবার্য। কিন্তু···কিভাবে সে মৃত্যু আসবে? সে অকল্পনীয় ভয়াবহ মৃত্যুর কথা ভাবতে গিয়ে শুধু লর্ড নন, দলের সবাই আতংকে শিউরে উঠল।

মেজর তবু ক্ষীণ আশা প্রকাশ করলেন। বললেন, আমার মনে হয় কারাটেটিকে খুন করায় সর্দার কৈ-কউমউ বরং মনে মনে

খুশীই হয়েছে। বরং ভালই হল। তার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী কমে গেল।

মেজরের এই আশ্বাসের কথায় কিন্তু কেউ তেমন আর উৎসাহ পেলো না।

দিন কাটলো। পরের দিনও কেটে গেল। অথচ তখনও কোন কিছুই হল না। ব্যাপার কি?

পরে জানা গেল, এখানকার এই জংলীদের মধ্যে একটি নিয়ম হল তাদের মৃতদেহ তিন দিন তিন রাত একই অবস্থায় ফেলে রাখতে হয়।

এদের বিশ্বাস হল মানুষের আত্মা মরবার পরেও তিন দিন পর্যন্ত দেহের মধ্যেই থেকে যায়।

তেরাত্রি কাটলে তবেই শুরু হয় সৎকারের ব্যবস্থা। সে সৎকার অনুষ্ঠান বড়ই ভীষণ।

সভ্য লোকেদের পক্ষে সেই বীভৎস দৃশ্য দেখা যে কি কষ্টসহ তা অনতিবিলম্বে শ্বেতাঙ্গ বন্দীদল উপলব্ধি করলো হাড়ে হাড়ে।

সৎকার অনুষ্ঠানের জন্যেই বুঝি লর্ডের শাস্তি দান কার্য স্থগিত আছে এই ধারণা হল বন্দীদলের।

কুটীরে বসে পর্দার ফাঁক দিয়ে ওরা দেখলো দুদিন 'পাহ্'-তে কোন জনপ্রাণী নেই।

মানুষের মধ্যে ওদের প্রহরী সৈন্যরাই বসে আছে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে। দুদিন দুরাত এই ধরণের নির্জনতায় কাটলো।

তারপর এল তৃতীয় দিন।

সেদিন সকাল থেকে কোত্থেকে যে শত শত জংলীরা এসে জুটলো এই 'পাহ'-তে। তাই দেখে শ্বেতাঙ্গ বন্দীদল বিস্মিত হয়ে গেল।

সেই জমায়েতে সর্দার কৈ-কউমউ কি যেন অবোধ্য ভাষায় গরম গরম কণ্ঠস্বর ও অভিব্যক্তির বক্তৃতা করলো।

বক্তৃতা শেষ হলে ইংরেজ বন্দীদের কুটীরের পানে আঙুল দেখিয়ে কি যেন আদেশ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে কজন প্রহরী দৌড়ে এল কুটীরের দিকে। তারপর বন্দীদের ডেকে নিয়ে গেল তার কাছে।

যেতে দেখা গেল সেই জমায়েতের একপাশে সর্দার কারাটেটির মৃতদেহটা নানাপ্রকার পোষাক ও লতাপাতা ফুল প্রভৃতি দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মাথায় বেঁধে দিয়েছে একগুচ্ছ রঙিন পালক।

শ্বেতাঙ্গ বন্দীদল সামনে যেতে চতুর্দিকের মাউরী জনতা ক্রুদ্ধ গর্জনে পরম উত্তেজিত হয়ে উঠল।

এই মারে এই মারে অবস্থা। মনে হল ক্রুদ্ধ জনতা বুঝি এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।

সর্দার কৈ-কউমউ লর্ডের দিকে তাকালেন রক্তাক্ত চোখে। তারপর হাত তুলে ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত হবার ঈঙ্গিত করলেন।

সমুদ্রোচ্ছ্বাস যেন থেমে গেল। মুহূর্তে জনতা চুপ হয়ে গেল।

সর্দার পুনরায় মুখ ঘোরালেন লর্ডের দিকে, বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, তুমি সর্দার কারাটেটিকে হত্যা করেছ?

—হ্যাঁ, অকম্পিত স্বরে লর্ড জবাব দিলেন, তা তো তুমি স্বচক্ষেই দেখেছ।

দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত মুখের শিরা উপশিরা ফুলিয়ে সর্দার কৈ-কউমউ দণ্ডবাণী উচ্চারণ করলে,

—শোন হে ইংরাজ উক্ত হত্যাকাণ্ডের জন্য তোমার শাস্তি দিলাম মৃত্যুদণ্ড। কাল সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু হবে।

—শুধু আমারই মৃত্যু হবে? লর্ড প্রশ্ন করলেন।

সে কথার জবাব দেবার পূর্বেই এক ঘটনা ঘটলো।

উল্কাবেগে সেখানে ছুটে এল একজন মাউরী সৈনিক।

সর্বাঙ্গে সৈনিকটির আঘাতের চিহ্ন, ক্ষতচিহ্ন। রক্তগুলো শুকিয়ে কালো হয়ে দেহে ও পোষাকে লেগে রয়েছে।

এর মধ্যে দু'একটা ক্ষত দিয়ে আবার তাজা রক্তও বের হচ্ছে এখনও।

হাঁফাতে হাঁফাতে সে এসে ওদের দেশীয় রীতি অনুসারে সর্দারকে সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন করলে।

অতঃপর উঠে দাঁড়াতে সর্দার কৈ-কউমউ আগন্তুক সৈনিককে প্রশ্ন করলে, তুমি দুশমন ইংরেজদের ওখান থেকে আসছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সর্দার।

—আমাদের পুরোহিত টহোন্নাকে ওখানে বন্দী অবস্থায় দেখেছ?

—দেখেছি সর্দার!

—তিনি বেঁচে আছেন তো? সুস্থ আছেন তো?

—না সর্দার।

—না, মানে?

—আমাদের মাননীয় পুরোহিত আর বেঁচে নেই সর্দার, সজল চক্ষে, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে আগন্তুক সৈনিক বললে, ইংরেজরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছে সর্দার!

শুনে উপস্থিত জনতা প্রথমটা বুঝি স্তম্ভিত হয়ে নীরব হয়ে গেল।

অতঃপর তাদের মধ্যে উঠল প্রবল ও উন্মত্ত কলগুঞ্জন।

কৈ-কউমউএর চোখ দপ করে জ্বলে উঠলো। বিশাল তার দেহ অসহ্য ক্রোধে কাঁপতে আরম্ভ করলো। দাঁতে দাঁত চেপে বন্দীদের উদ্দেশ্য করে বললে, ওরে বজ্জাতের দল, তোদের প্রত্যেককে কাল সকালেই হত্যা করে ফেলা হবে। আজকের দিনটার মত রক্ষা পেলি শুধু কারাটেটির শব সৎকারের দিন বলে।

কড়া পাহারায় শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের পুনরায় তাদের কুটীরে নিয়ে যাওয়া হল।

কিন্তু···আশ্চর্য ঘটনা···রবার্ট আর প্যাগানেলকে এই জংলীরা

কোথায় নিয়ে গেল, কোথায় গুম করে ফেললো। ওদের দুজনকে সরিয়ে নিয়ে আলাদা রাখবার উদ্দেশ্যই বা কি হতে পারে।

শ্বেতাঙ্গ বন্দীরা এর কোন মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। আজ রাত তাদের শেষ রাত। কাল সকালেই তাদের হত্যা করা হবে।

## ॥ ষোল ॥

শোনা গেল, দুপুরবেলা কারাটেটির শব সৎকার অনুষ্ঠিত হবে।

সে ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার জন্য এক সময় সর্দারের কাছ থেকে একটা লোক এসে প্রহরারত সৈনিকদের কি যেন বললে।

সৈনিকরা শ্বেতাঙ্গ বন্দীদলকে নিয়ে গেল যেখানে শব সৎকার হবে সেই নির্দিষ্ট স্থানে।

একটা বিরাট গাছের তলায় এনে কারাটেটির মৃতদেহটা রাখা হয়েছে।

চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েক শত জংলী মাউরী।

তাদের মধ্যে অনেক সর্দার জাতীয় মানুষকেও দেখা গেল। এমনিতে বাদবাকি সবাই অজস্র নরনারী আবালবৃদ্ধবণিতা।

নজরে পড়ে সবাই বিশেষ ধরণের বিচিত্র সাজে সজ্জিত হয়ে এসেছে।

এক সময় সেই বীভৎস সংকার অনুষ্ঠান শুরু হল।

কারাটেটির মৃতদেহটাকে পূর্বেই চপচপে করে তেল মাখিয়ে রাখা হয়েছে।

চতুর্দিকের জনতা বিকট কান্না এবং অদ্ভুত হা হুতাশে শোক করছে।

সর্দার কৈ-কউমউএর নিকট আত্মীয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড দিয়ে নিজেদের দেহ ক্ষত বিক্ষত করে রক্তে মাখামাখি অবস্থায় আকাশফাটা কান্নায় স্থানটাকে আরও দুঃসহ, আরও ভয়াবহ করে তুলেছে।

একদল সৈনিক এমনভাবে দাঁত কিড়মিড় করে অবোধ্য ভাষায় ইংরেজ বন্দীদিগের প্রতি চেয়ে বিকট ভাবে শাসিয়ে উঠলো যে, মনে

হল এক্ষুনি বুঝি তারা ছুটে এসে ওদের ঘাড় মটকে রক্ত খাবে বা ওদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু ঐ দূর থেকেই যা হম্বিতম্বি। সৈনিকরা নিজেদের স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে এল না। এগিয়ে আসবার উপায়ও ছিল না।

কেননা শ্বেতাঙ্গ বন্দীদল যে 'টেবু'-দ্বারা রক্ষিত।

সর্দার কৈ-কউমউ এমন সময় কি একটা ইঙ্গিত করে উঠলো।

অমনি শুরু হয়ে গেল সমবেত কণ্ঠে শ্মশান-সঙ্গীত।

সে বিকট সঙ্গীত কানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে পিলে শুদ্ধ চমকে ওঠে।

এক সময় সেই ভুতুড়ে সঙ্গীত শেষ হল।

গান শেষ হলে দেখা গেল একটি সুশ্রী তরুণী মেয়ে উথালি-পাথালি কাঁদতে কাঁদতে কারাটেটির মৃতদেহের কাছে এগিয়ে আসছে।

এ তরুণী মেয়েটি হল মৃত কারাটেটির স্ত্রী।

একে সহমরণে যেতে হবে।

শোকের আধিক্যে মেয়েটি সহসা মাটিতে পড়ে আকুলি-বিকুলি করে কাঁদতে লাগলো। এক সময় সে প্রচণ্ডভাবে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগলো।

সর্দার কৈ-কউমউ অনেকটা মার্চ করার ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল তরুণীর কাছে।

তার হাতে ধরা রয়েছে একটা বিরাট আকারের গদা।

এরপর যা ঘটলো তা দেখে আতঙ্কে প্রায় চোখ বুজে ফেললো শ্বেতাঙ্গ বন্দীরা।

সর্দার কৈ-কউমউ' সরাসরি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটি মাটি থেকে মাথা তুলতেই সেই ভীষণ গদা দিয়ে প্রচণ্ড এক আঘাত করল তরুণীর মাথায়।

সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা দুভাগ হয়ে গিয়ে সাদা ঘিলু বেরিয়ে এল।

রক্ত ছুটলো ফোয়ারার মত। আর মেয়েটির দেহ কাটা পাঁঠার মত কয়েকবার ছটফট করে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিগত প্রাণ তরুণীর মাথা থেঁতলানো বীভৎস দেহটা পড়ে রইল রোমহর্ষক ভাবে।

অতঃপর দুজন জংলী জোয়ান তরুণীর দেহটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কারাটেটির মৃতদেহের পাশে শুইয়ে দিল।

এর পর নিয়ে আসা হল ছয় জন ক্রীতদাসকে। কারাটেটির ভৃত্য ছিল এরা।

মাউরীদের প্রচলিত রীতি অনুসারে জীবিত কালে যারা ভৃত্য থাকে মরে যাওয়ার পরেও তাদের প্রভুদের সঙ্গে সহমরণে গিয়ে পরলোকেও সেবা-শুশ্রূষা করতে হয়।

অতএব, এই ছয় জন ক্রীতদাসকেও অনিবার্য মৃত্যুবরণ করতে হবে।

বেচারারা বুঝি মৃত্যুভয়ে বিবশ দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খাওয়া ফ্যালফেলে দৃষ্টি সহকারে ধীর পদক্ষেপে নিজেদের বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে গেল। দেহে যেন তখনই কোন চেতনা নেই, প্রাণ নেই।

চিরাচরিত প্রথা।

দেশাচার। যেন নিয়তির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম।

দেহটা চলতে হয় চলছে, ভাবলেশহীন মুখ, দৃষ্টিতে বিহ্বলতা। অতি আতংকে বুঝি পাথর হয়ে গেছে ছটি যুবক ভৃত্য।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দানব সদৃশ আকৃতির দুজন ঘাতক এগিয়ে গেল ওদের দিকে। হাতে তাদের এক একটি ভীষণাকৃতি গদা।

যেন কিছু নয় এমন সহজ সরল ভাবে এই নৃশংস কাজটি ওরা মুহূর্তে সমাধা করে ফেললো। এক এক করে এক একটি প্রচণ্ড গদাঘাতে ছয়জন ভৃত্যকে এজন্মের মত লীলাখেলার পাট চুকিয়ে দিল। চারপাশটা যেন রক্ত নদী হয়ে গেল।

এবং এর পরই প্রত্যক্ষ করা গেল অকল্পনীয় ও অমানুষিক নরখাদকের লীলা।

সর্দার কারাটেটি ও তার তরুণী স্ত্রীর মৃতদেহ 'টেবু' দ্বারা রক্ষিত। অতএব তা অভক্ষ্য।

কিন্তু ভৃত্য ভৃত্যই। তাদের মৃতদেহ বেওয়ারিশ, কাজে কাজেই বুঝি সেগুলো ভোজ্য সামগ্রী।

সভয়ে শ্বেতাঙ্গ বন্দীদল দেখলো চারপাশের জনতা নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্রীতদাসদের ছটা মৃতদেহের ওপর।

চোখের পলকে টুকরো টুকরো করে কেটে ছিঁড়ে ফেললো শবদেহগুলি।

আর সেইসব টুকরো সমূহ কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যে যার মুখে পুরে চিবুতে লাগলো।

উঃ কী ভয়াবহ ও ঘৃণ্য দৃশ্য! কী ভয়ংকর ব্যাপার, শেষে কিনা এও দেখতে হল। নরমাংস ভক্ষণ!

শ্বেতাঙ্গ বন্দীগণ দুহাতে চোখ ঢাকলো।

লেডি হেলেনা ও মেরী তো প্রায় জ্ঞান হারিয়েই ফেললো। উঃ মাগো…। পুরুষ সঙ্গীরা তাদের ধরে না ফেললে মাটিতেই পড়ে যেত তারা।

এইভাবে ঘণ্টাখানেক ধরে যে হুল্লোড় চললো তাকে এক কথায় পুরোপুরি নারকীয় বলা চলে।

এরপর কারাটেটি ও তার স্ত্রীর মৃতদেহ দুটোকে পাল্কীর মধ্যে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, এখান থেকে দু মাইল দূরের ম্যানগানামু নামক আটশ' ফুট উঁচু এক পর্বতে।

সেখানে সেই পর্বতশীর্ষে ওদের জন্যে পাথর ও গাছপালা দিয়ে একটি সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করা হয়েছে।

পাল্কী করে বহন করে মৃতদেহ দুটি সেখানে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করল।

শুধু তাই নয়, মাউরীদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মৃত স্বামী-স্ত্রীর উপযুক্ত বিছানাপত্র, পোষাক-আশাক এবং প্রায় কয়েক মাসের মত খাদ্য সামগ্রী, পানীয় জল প্রভৃতি সব কিছু সে সমাধি-মন্দিরে জমা রাখা হল। পরকালে খাওয়া দাওয়া প্রভৃতির জন্মেই এই সব ব্যবস্থা।

অবশেষে এক সময় জংলী জনতার মিছিল শেষবারের মত নেমে এল পাহাড়ের শিখর থেকে।

শেষবারের মত এই জন্যে যে ঐ পাহাড় এখন থেকে হয়ে গেল টেবু দ্বারা চির রক্ষিত।

ওখানে নিয়ম ভেঙ্গে কেউ গেলেই তার মৃত্যুদণ্ড।

এ জন্মের মত জংলীদের ঐ পাহাড়ে ওঠা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

যেমন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে টংগারিকা পাহাড়, যেখানে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে নিহত এক সর্দারের মৃতদেহ সমাহিত রয়েছে।

এই সব দৃশ্য শ্বেতাঙ্গ বন্দীরা 'পাহ'-এর ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করল।

একটা যেন দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে তাদের সময় অতিবাহিত হল। এটি দেখলো তারা? এ যে অভাবনীয় এ যে কল্পনাতীত, এ যে বীভৎসতম ভয়ংকর।

এরপর বন্দীদের পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে কুটিরে আটকে রাখা হল।

রবার্ট বা প্যাগানেলকে এবারও কোথাও দেখা গেল না। ভীষণ চিন্তার ব্যাপারই হল। ব্যাটারা মেরে ফেললো নাকি ওদের, এই অমঙ্গল চিন্তাই পাক খেতে লাগলো বন্দীদের মনে।

## ॥ সতের ॥

রাত তার নিঃসীম অন্ধকার নিয়ে নেমে এল বনে জঙ্গলে পাহাড়ে নদীতে।

পাহ-এর মধ্যে বন্দীদের কুটিরও রাত্রির আবরণে ঢাকা।

আজ শেষ রাত্রি।

কাল সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদের মৃত্যু হবে। নৃশংস মৃত্যু। সে মৃত্যুর কথা বুঝি কল্পনা করা যায় না।

স্তম্ভিত হয়ে সবাই বসে রইল।

ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রা সব বুঝি বিলীন হয়ে গেছে।

লর্ড গ্লেনারভ্যান শেষ পর্যন্ত সবাইকে সাহস দিয়ে যেতে লাগলেন।

বলতে লাগলেন, মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন ভয় ত্যাগ করো। আসল মৃত্যুর পূর্বে ভীরুরা হাজার বার মরে। আমরা তো ভীরু নই। এমন ভাবে আমরা মৃত্যুবরণ করব যাতে করে এই জংলীদের বুঝিয়ে দিতে পারি যে মৃত্যুকে আমরা আদৌ ভয় পাই না। এস আমরা প্রার্থনা করি···শেষ প্রার্থনা, কথা বলতে বলতে লর্ডের কণ্ঠ আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠল।

তারপর তারা সবাই মিলে পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো। শেষ প্রার্থনা।

রাত্তিরে ওদের খেতে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল সেগুলো তেমনি পড়ে রইল। কারুর আর তা দাঁতে কাটবার মুখে তোলবার ইচ্ছে রইল না।

ক্লান্তিতে আর ভয়ে মেয়েরা শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে পর লর্ড এক সময় বললেন, দেখো জন, আমরা নয় মরি মরবো, তাতে তেমন খেদ নেই কিন্তু এই মেয়ে

দুটিকেও যে আমাদের সঙ্গে এই ভয়াবহ মৃত্যুবরণ করতে হবে, এ কথা ভেবে আমার আর দুঃখ ও আফশোসের সীমা পরিসীমা নেই। উঃ কী মর্মান্তিক। হা ঈশ্বর।

গলা ধরে এল লর্ডের। কিছুটা সামলে নিয়ে ফের বললেন, আরেকটা ভাবনা আমাকে এখন বড়ই বিচলিত করে তুলেছে। সেটা হল, এই অসভ্য জংলীরা যদি মেয়েদের কোনপ্রকার অত্যাচার করে মানে···মান সম্মানে যদি আঘাত হানে, তাহলে? তার চেয়ে ···তার চেয়ে এক কাজ করলে কেমন হয়?

—কী কাজ লর্ড? জন ম্যাঙ্গলস্ জিগ্যেস করলো।

—জংলীদের হাতে মরার পূর্বে, ওদের মৃত্যু আমাদের হাতেই হোক। লেডি হেলেনাও সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিলেন এক সময়। কিন্তু রিভলবারটিতো হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন অস্ত্র কোথায় পাই?

—অস্ত্রের জন্যে ভাববেন না লর্ড, জন ম্যাঙ্গলস্ তার পোষাকের অন্তরাল থেকে একটা ছোরা বের করে বললে, কারাটেটি যখন মারা যায়, তার কোমরে গোঁজা এই ছোরাটি আমি কায়দা করে হস্তগত করে লুকিয়ে ফেলি।

—সাবাশ! বলে লর্ড পুনরায় বিমর্ষ হয়ে গেলেন, বললেন, এখুনি অবশ্য কোন কিছু করতে যাওয়া হটকারিতা হবে জন। যদি দেখা যায় জংলীরা প্রকৃতই কোন অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছে, তবেই এই চরম পন্থা অবলম্বন করা হবে, নচেৎ এ নৃশংস কাজ নয়, বুঝলে? হায় নিজেদের হাতে নিজেদের আত্মজনকে হত্যা করা যে কি দুঃসহ তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। ওহ্ গড।

কিছুক্ষণের জন্য এরপর নেমে এল এক কঠিন নীরবতা, মরণ নিস্তব্ধতা। কারুর কিছু বলবার নেই। কিইবা বলবার আছে। পরিণাম তো জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। মৃত্যুর প্রহর গোনা ছাড়া হাতে আর কোন কাজ নেই।

সময় কাটতে লাগল।

ভয়ংকর রাত্রি পলে পলে ক্ষয়ে যেতে থাকল।

লর্ড একবার সখেদে বলেছিলেন, সঙ্গে মেয়েরা থেকেই হয়েছে মুস্কিল। ওরা যদি না থাকত দলে তাহলে শেষবারের মত একবার লড়ে দেখা যেত জংলীদের সঙ্গে। পরিণতি যাই হোক না কেন। কিন্তু মেয়েরা সঙ্গে থেকেই হয়েছে মহা মুস্কিল।

পালাবার কোন উপায়ও নেই। যে ঘরটায় ওরা আছে তার পেছনে সুউচ্চ পাহাড়ের দেওয়াল। একপাশে গা শিরশির করা গহ্বর খাড়াই নেমে গেছে বোধ করি একশ ফিটেরও বেশী।

সেখান দিয়ে পালানো অসম্ভব।

সামনে পাহ্-এর মধ্য দিয়ে তো কথাই ওঠে না, প্রশ্নই ওঠে না—সেখানে রয়েছে সদাসতর্ক প্রহরীদল।

দুঃসহ সময় কাটতে লাগলো।

বিচিত্র সব রাতের পাখীদের উদ্ভট সব কলকাকলীতে রাতের প্রহরগুলি যেন অবাস্তব হয়ে উঠছিল।

কেউ কোথাও জেগে আছে কিনা কে জানে।

তবু সময়, দুঃসহ সময় পলে পলে গলে যেতে লাগলো মোমের মত।

রাত তখন বোধ করি চারটে হবে।

বন্দীদলের চোখে নেমেছে সাময়িক তন্দ্রাচ্ছন্নতা……

এমন সময় ঘড়ঘড় একটা আওয়াজে সবাই চমকে উঠল।

কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করল সবাই।

যে দিকটায় রয়েছে গা শিরশির করা গহ্বর।

শব্দটা যেন সেই দিককার মেঝের তলা থেকেই আসছে।

আওয়াজ শুনে মনে হয় মাটি খোঁড়বার শব্দ। সিঁদ কাটার শব্দ। তাহলে এটা কিসের শব্দ হতে পারে।

হয়ত বা কোন জন্তু-জানোয়ার গর্ত খুঁড়ছে।

সবাই আবার উৎকর্ণ হল। কান পাতলো। শব্দ যেন ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

জন্তু-জানোয়ার? না, মানুষ? এ নিশ্চয়ই কোন মানুষ গর্ত খুঁড়ে ঘরে ঢোকবার তালে আছে।

এ আবার কি নতুন বিপদ রে বাবা? কে বা কারা হতে পারে?

যে বা যারাই হোক বন্দীরা স্থির করল তারাও মেঝে খুঁড়তে থাকবে। তারপর যা হয় হোক, দেখা যাক কি হয়।

কারাটেটির ছোরাটা এবার কাজে লাগলো। ছোরা এবং খালি হাতে শুধু আঙুলের সাহায্যে সবাই মিলে শব্দ আসা স্থানের মেঝে ওপর থেকে খুঁড়তে শুরু করে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ ছোরার ফলা নিচের ওপিঠ থেকে মেজরের হাতে এসে লাগলো।

—উঃ! চেঁচিয়ে উঠল মেজর। কিন্তু পরমুহূর্তে ঠোঁট কামড়ে সামলে নিল পাছে সে শব্দ বাইরের প্রহরীদের কানে যায়।

সতর্ক হয়ে তাকিয়ে রইল সবাই মেঝের গর্তের দিকে। যদি কোন জংলীর মাথা দেখা দেয় সেখানে তাহলে নিজেদের একটি ছোরার ঘায়ে বাছাধনকে শেষ করে ফেলা হবে এই ছিল মতলব।

কিন্তু এটি? আরে! এযে একটি সাদা হাত বেরিয়ে এল। এতো জংলীর কোন হাত নয়। দেখা গেল একটি শ্বেতকায় হাত তলা থেকে ফুঁড়ে উঠে গর্তের মুখ বড় করতে লাগলো।

লর্ডগ্লেনারভ্যান সানন্দে ফিসফিসিয়ে বলে ওঠেন, আরে এ যে রবার্টের হাত।

—রবার্ট! মেরী উল্লাসে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল।

—কে, রবার্ট তো? লর্ড গর্তের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করেন!

—হ্যাঁ লর্ড, আমি রবার্টই, নিচ থেকে উত্তর আসে।

অব্যক্ত আনন্দের ঢেউ পড়ে গেল বন্দীদের মধ্যে। দ্বিগুণ উৎসাহে

সবাই ওপর থেকে গর্ত খুঁড়ে গর্তের মুখ বড় করতেই ধুলোবালি মেখে সশরীরে শ্রীমান রবার্ট উঠে এল ঘরের মধ্যে।

—কী ব্যাপার, বলতো? কোথায় ছিলে? কি করে এলে? জংলীরা দেখেনি তো তোমায়? ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন বর্ষিত হতে লাগলো চুপিসারে।

এটা সত্যি একটা প্রকাণ্ড রহস্যে ভরা ঘটনা।

—শিগ্‌গির বল রবার্ট কি ঘটনা? কি করে এমনটা সম্ভব হল।

## ॥ আঠারো ॥

উত্তরে রবার্ট যা জানালো তা এই :

কারাটেটিকে হত্যা করবার সময়ে হৈ-হট্ট গোল ও জংলীদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে সে পালায়। তারপর দুদিন জঙ্গলে বাস করে যেদিন শব সৎকার হয় সেদিন জংলীদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে এসে এই কুটিরের নিচেটা পর্যবেক্ষণ করে যায়।

অতঃপর একটা পরিত্যক্ত কুটির থেকে বিরাট এক গাছা দড়ি এবং এই ছোরাটা কুড়িয়ে পায়।

কিছু ডালপালা এবং এই দড়ির সাহায্যে সে পাহাড়ের গা শিরশির করা খাড়াই দেওয়াল বেয়ে ওঠে।

এরপর পাহাড়ের গায়ে ঘরের দিকে একটা ছোট, গুহার মত গর্ত দেখে খুড়তে আরম্ভ করে।

—সাবাস! সাবাস রবার্ট, আনন্দে লর্ড গ্লেনারভ্যান ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন।

মেয়েরা ওকে ধরে আনন্দাশ্রু ফেলতে লাগল।

রবার্ট বললে, আর দেরী করা উচিত নয়।

—কিসের দেরী?

—কেন পালাবার?

—পালাবার? বল কি?

—হ্যাঁ তাই, রবার্ট বলে ওঠে, সে জন্যেই তো এত কষ্ট করে এই কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। আর দেরী নয়, একজন পর্দার ফাঁক দিয়ে প্রহরীদের দিকে নজর রাখুন। আর বাদবাকী একে একে এই গর্ত দিয়ে নেমে পালিয়ে চলুন।

সত্যিই আর বিলম্ব করা কর্তব্য নয়।

এ রকম অভাবনীয় স্বুবর্ণ স্বুযোগ বুঝি বিধিদত্ত। ঈশ্বর করুণাময়, ঈশ্বর মঙ্গলময়।

নয়ত কেইবা ভাবতে পেরেছিল একটু আগেও যে পরিত্রাণের এমন অবাক করা স্বুযোগ আসবে। এ রকম দিক দিয়ে স্বুযোগ আসবে।

অতঃপর দুরু দুরু কম্পিত বক্ষে আনন্দে উল্লাসে উত্তেজনায় ওরা এক একজন করে গর্ত দিয়ে-নেমে সেই গহ্বরের মুখে গুহার ভেতর এসে দাঁড়ালো।

অবশেষে সেই গা শির শির করা খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে ঝুলন্ত দড়ির সাহায্যে সবাই নিচে নেমে যেতে লাগলো।

চারদিকে নিঃসীম অন্ধকার রাত্রি।

এদিকে প্রহরীরা কুটিরের সম্মুখভাগে আন্দাজ তিরিশ হাত দূরে বসে রয়েছে। অথচ তারা কিন্তু এত সব কাণ্ডের কথা ঘুণাক্ষরেও টের পেল না।

রবার্টকে জিগ্যেস করা হল, হ্যাঁ হে প্যাগানেলের কোন সংবাদ জানো। সে কোথায়? কোথায় গেল সে?

রবার্ট জানালো সে প্যাগানেলের কোন সংবাদই জানে না। ওর সঙ্গে তার দেখাই হয় নি।

শুনে সবার মনে দুশ্চিন্তার অবধি রইল না। মনটা বেদনায় টনটন করতে লাগলো।

যাই হোক এখন এই মুমূর্তে বুঝি ওদের শোক করবারও সময় নেই, অবসর নেই।

এখন যঃ পলায়তি···পন্থাই শ্রেয়।

অন্ধকারের মধ্যে তারা সবাই প্রায় ছুটেই চলল।

ভোর হবার পূর্বেই এই শত্রুপুরী থেকে, এই দুশমনদের এলাকা থেকে বহুদূরে পাড়ি জমাতে হবে।

তাই শ্বেতাঙ্গ দলটি প্রাণপণে এগিয়ে চলতে লাগলো।

পথটা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। নিচে এক পাশে তাকালে আবছা দেখা যাচ্ছে হ্রদটাকে।

চলার বিরাম নেই। অক্লান্ত পরিশ্রম, চলতে চলতে হোঁচট খেয়ে প্রতি মুহূর্তে আঘাত।

চড়াই উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

তা হোক, প্রাণ আগে, প্রাণ বাঁচাতে গেলে দ্রুত পালাতেই হবে।

সেই চড়াই পথে ওরা যখন প্রায় আটশ ফুটের কাছাকাছি উঠে এসেছে এমন সময় ভোরের আলো দেখা দিল পুব আকাশে।

চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তাই দূরের কোন কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

অনিদ্রায়, পথশ্রমে সবারই শরীর অবশ হয়ে আসছে। দেহ আর বইছে না। তবু উঠতে হবে। উঠছেও তাই নিরূপায় হয়ে।

সবই ভাল কিন্তু প্যাগানেল-এর কথাটা মনে পড়তেই বুকের ভেতরটা খচখচ করতে লাগলো সবার। বেচারার কি হল কে জানে।

এক সময় টকটকে লাল সূর্য উঠে এল পুব আকাশে।

সূর্য উঠতেই কুয়াশা যেন ভয়ে পালিয়ে গেল। চতুর্দিক ফর্সা হয়ে আলো ঝলমল দিন শুরু হল।

এমন সময় এক কাণ্ড দেখে ওদের রক্ত জল হয়ে গেল। প্রথমে ওরা চমকে উঠল সমবেত কণ্ঠের এক বিকট হৈচৈ গণ্ডগোল।

নিচের দিকে চেয়ে পিলে চমকে গেল সবার। হ্রদের পাড় ঘেঁষে শত শত জংলীরা মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দৌড়ে উঠে আসছে ওপরে।

বিকট চিৎকারে মেদিনী কাঁপিয়ে ছুটে আসছে সব।

সর্বনাশ! মাউরীরা তো তাদের 'পলায়ন' কাহিনী টের পেয়ে গেছে তাহলে? কি হবে?

চলো, চলো আরো জোরে চল, পালাও যদি প্রাণে বাঁচতে চাও প্রাণপণে পালাও, লর্ড গ্লেনারভ্যান চিৎকার করে আদেশ করলেন,

নয়ত রক্ষা নেই, পরিত্রাণ নেই। ওদের হাতে পড়লে আমাদের টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে।

শেষ শক্তি দিয়ে ওরা ছুটে চললো।

নিচে দেখা গেল জংলী জনতাও উঠে আসছে, দ্রুত উঠে আসছে পঙ্গপালের মত, বিকট হৈ-হট্টগোল করতে করতে।

ওদের সঙ্গে দৌড়ে পারবার জো নেই। এগিয়ে এল বলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরে ফেলবে। হায় হায় কি সর্বনাশ। ঘাটে এসে তরী ডুবে গেল বুঝি। কি দুর্দৈব।

আর উপায় নেই।

ঈশ্বরকে স্মরণ কর সব। এত কষ্টের ফন্দিফিকির সব বুঝি মাঠে মারা গেল। পরিত্রাণ বরাতে নেই।

মেয়েরা প্রায় কান্না শুরু করল।

যে দুর্দান্ত গতিতে জংলী জনতা এগোচ্ছে তাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই ক্লান্ত ভীত সন্ত্রস্ত শ্বেতাঙ্গ দলটাকে ধরে ফেলবে…আর তারপর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে…উঃ আর ভাবা যায় না।

## ॥ উনিশ ॥

শ্বেতাঙ্গ দলটি প্রায় পর্বতশীর্ষে উঠে এসেছে আর জংলীরা শ'তিনেক ফুট নিচে তখন—

সহসা মেজর পেছন ফিরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, আরে! চেয়ে দেখুন লর্ড। কি যেন একটা ব্যাপার হয়েছে ওদের। দেখুন দেখুন।

সবাই তখন পেছন ফিরে তাকালো। যে দৃশ্য দেখলো তাতে বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

দেখলো সেই চলন্ত হিংস্র সশস্ত্র পঙ্গপালের মত জংলী জনতা শ'তিনেক ফুট নিচে সহসা দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এক পা-ও আর অগ্রসর হচ্ছে না।

কি ব্যাপার হল? অকস্মাৎ থেমে পড়লো কেন? আশ্চর্য তো।

দেখা গেল সেখানে দাঁড়িয়েই তারা উন্মত্তের মত হম্বিতম্বি করতে লেগেছে এবং হাত পা নেড়ে বীভৎস চিৎকার জুড়ে দিয়েছে ওদের পানে তাকিয়ে।

ব্যাপারটা প্রথমে কিছু বোঝা গেল না।

শেষে জন ম্যাঙ্গলস আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠল, আরে এটা যে 'ম্যানগানামু পাহাড়। কারাটেটির সমাধিস্থল সেই পাহাড়। এটা তো 'টেবু' দ্বারা রক্ষিত। এখানে তো জংলীরা জীবন থাকতে আসবে না।

এতক্ষণ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ দল খেয়ালই করেনি যে পালাবার মুখে ওরা এই ম্যানগানামু পাহাড়ে এসে উঠেছে।

উঃ ঈশ্বর! তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। কি বাঁচানোই না বাঁচিয়ে দিলে।

অনতিদূরে পর্বতশীর্ষে দেখা যাচ্ছে কারাটেটির সমাধি মন্দির

সবাই ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেল।

লর্ড গ্লেনারভ্যান সমাধি মন্দিরের পরদা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে চকিতে এক লাফে নিচে নেমে এলেন। আতঙ্কে বলে উঠলেন।

—ভেতরে একটা জংলী বসে আছে।

—জংলী! সেকি!

এখানে জংলী আসে কি করে! এটা তো জংলীদের কাছে টেবু অঞ্চল। তাহলে? তাজ্জব ব্যাপার তো! কার এমন বুকের পাটা যে…।

সবাই সতর্ক হয়ে অতি সাবধানে সহসা এক সঙ্গে পরদা ফেললো। ভেতরে দেখা গেল প্রকৃতই সেখানে একটা লোক লতা-পাতার পোষাক পরে বসে আছে।

অন্ধকারে সঠিক চেহারা বা মুখাবয়ব বোঝা যাচ্ছে না। জংলীদের এখানে আসা নিষিদ্ধ। তবে এটা এলো কি করে?

—কে? কে তুমি, সবাই সমস্বরে চিৎকার করে বলে ওঠে, হাত তুলে দাঁড়াও, এগিয়ে এস হাত তুলে, নয়ত—

মাঝপথেই ভেতরের লোকটা অতি পরিচিত কণ্ঠে বলে ওঠে, ভয় পাবেন না আমায় দেখে। নির্ভয়ে ভেতরে চলে আসুন। আপনাদের খাবার তৈরী রেখেছি।

বিস্ময়ের ধাক্কায় কয়েক মুহূর্ত সবাই যেন বাক রুদ্ধ হয়ে রইল। তারপর উল্লাসের আধিক্যে সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, আরে এ যে প্যাগানেলের কণ্ঠ। ওমা! আরে প্যাগানেল তুমি এখানে? কি ব্যাপার? কি করে তুমি এখানে এলে। এতো বড় তাজ্জব ব্যাপার দেখছি।

একই সঙ্গে সকলের এতগুলি প্রশ্নের জবাবে প্যাগানেল সবিস্তারে জানায়, সেও ঐ কারাটেটি হত্যার সময়েই অতর্কিতে পাহ্‌ থেকে পালিয়ে যায় কিন্তু সহসা গিয়ে ধরা পড়ে এক সর্দারের হাতে। সেই

সর্দার ওকে দিবারাত্র ক'দিন বন্দী করে রাখে। মহা বিপদে পড়ল সে। এক বন্দীদশা থেকে আরেক বন্দীদশা। এখানে তবু স্বজনরা ছিল ওখানে তাও নেই, একা সে নিঃসঙ্গ। তবু বরাত ভাল, এরপর এ সুযোগ এল। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার সে করল। নতুন সর্দারের-খপ্পর থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় এই কারাটেটির সমাধি মন্দিরে।

সে জানে এটা টেবু দ্বারা সংরক্ষিত। সুতরাং জংলীদের অগম্য স্থান।

সুতরাং সে এখানে সে বেশ আরামেই বাস করছে।

কিন্তু খাওয়া দাওয়া করছ কি? নিরম্বু উপবাসেই বোধ করি দিন কাটছে তোমার?

না না তা কেন হবে। খাওয়া দাওয়ার আদৌ ভাবনা নেই। মৃতদের জন্য রক্ষিত আছে প্রচুর খাবার। সেই সব খাদ্য আর পানীয়ের দৌলতে বেশ মৌজেই দিন কাটছে, জানালে প্যাগানেল।

আবার ঈশ্বরের করুণার কথা মনে পড়ল সবার। তাঁর কৃপা না থাকলে এসব হয়?

এখানে এসে তাই সকলে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে।

অতঃপর কিছু আহার্য গ্রহণ করে সকলে সুস্থ হল। শরীর মন জুড়ালো।

পর্বতশীর্ষ থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো জংলীরা তখনও ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

থাকগে। মরুকগে। দেখা যাক ব্যাটারা কতদিন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

এখানে তো আর উঠে আসতে পারবে না বাছাধনেরা। সে গুড়ে বালি।

সেদিনটা কেটে গেল।

সে রাত্তিরও গেল।

কিন্তু এভাবে তো একটা ভূতুড়ে পর্বতশীর্ষে চিরকাল থাকা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

মৃতদের জন্য রক্ষিত যা খাবার দাবার রয়েছে তাতে করে শ্বেতাঙ্গ দলটির বড় জোর পনের কুড়ি দিন ভরপেট খাওয়া চলতে পারে।

কিন্তু তারপর?

তারপর তো অনাহারে তিলে তিলে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে।

অতএব এখান থেকে পালাবার চিন্তা করা দরকার, ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় দিন রাত্তিরে একটা চেষ্টা করা হল। পাহাড়ের পেছন দিয়ে পালাতে গিয়ে দেখা গেল জংলী মাউরীরা দমাদ্দম গুলি ছুঁড়ছে।

সাঁই সাঁই করে কালান্তক কতগুলো গুলি ওদের অনেকের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। সামান্যর জন্য গায়ে লাগলো না। অল্পের জন্য হতাহত হল না।

ফিরে আসতে হল কাজে কাজেই।

না, পালানো দুষ্কর।

যা দেখা যাচ্ছে, না খেয়েই হয় তো কারাটেটির সমাধির পাশে মরে পড়ে থাকতে হবে।

আরও একটি দিন এবং আরও একটি রাত্রি কাটল।

নিচের দিকে চেয়ে দেখা গেল জংলী জনতা তখনও সেখানে ঠায় পাহারা দিচ্ছে। সে যায়গা থেকে একচুলও নড়েনি। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শ'দুই লোক ক্রমান্বয়ে পালা করে পাহারা দিচ্ছে সেখানে।

শ্বেতাঙ্গ দলটি গোল হয়ে বসলো, বিস্তর আলাপ আলোচনা করলো। নানাদিক বিবেচনা করে নানাবিধ ফন্দী ফিকিরের কথাও হল। কিন্তু পালাবার জুতসই কোন পন্থা বা প্রক্রিয়া আবিষ্কার করা গেল না।

এইভাবে ক্রমাগত ভাবনা চিন্তার পর চতুর্থ দিনের দিন প্যাগানেল চেঁচিয়ে উঠল—পেয়ে গেছি। পেয়েছি!

—কি পেয়েছ? সবাকার বিস্মিত প্রশ্ন।

—পেয়েছি পালাবার পথ, প্যাগানেল মাথা নেড়ে জবাব দেয়।

অতঃপর "আসুন" বলে সবাইকে পর্বতশীর্ষের একটা স্থানে নিয়ে গিয়ে বললে, এই যে দেখছেন জায়গাটা, এটা বেশ গরম বলে মনে হচ্ছে, না?

—তা হচ্ছে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

—তবে শুনুন, প্যাগানেল তার প্ল্যান বাতলালে, এখানকার প্রতিটি পাহাড়ই আগ্নেয়গিরি। এই ম্যানগানামু পাহাড়ও তাই। আমরা যদি যে কোন স্থান এখানে খুঁড়তে আরম্ভ করি তাহলে অচিরেই দেখবো সেখান থেকে ধোঁয়া আর আগুন বের হচ্ছে।

—তা তো বুঝলাম। এবারে তোমার মতলবটি ব্যক্ত করো।

—বলছি। আমি ঠিক করেছি এ স্থানটি খুঁড়ে দেব। তখন জংলীরা দূর থেকে সেই অগ্ন্যুৎপাত দেখে ভেবে নেবে যেহেতু আমরা 'টেবু' অমান্য করে এই পবিত্র পাহাড়ে ঢুকেছি, সেহেতু ঈশ্বরের অভিশাপে আগুন ধরে গিয়ে আমাদের ঈশ্বর আগুনে পুড়িয়ে মারছেন। আমাদের মৃত্যু অনিবার্য ভেবে ওরা পাহারা ছেড়ে এক সময় চলে যাবে। তখন মজাসে পেছনের পথ ধরে আমরা পাহাড় পার হয়ে যাব।

—'মার্ভেলাস! চমৎকার ফন্দী বলেছ তো প্যাগানেল' অতীব উল্লসিত হয়ে জন ম্যাঙ্গলস্ বলে উঠল, রিয়েলি মাথা আছে বটে তোমার। সাবাশ ব্রাদার।

—কিন্তু, সুগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল লর্ডের, সে আগুনে আমরা আবার সত্যি সত্যি পুড়ে মরে না যাই।

—সেদিকটাও আমি ভেবে রেখেছি লর্ড, প্যাগানেল বললে, তার জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আমাদের দিকটা অর্থাৎ

সমাধি মন্দিরের দিকটা পাথর দিয়ে একটা প্রাচীরের মত করে দেব। আর গর্তটাও এমন কায়দা করে ঢালু ভাবে খুঁড়বো যাতে লাভাস্রোত ঐ জংলীরা যে দিকে পাহারা দিচ্ছে সে দিকেই গিয়ে পড়ে।

—সাবাশ! আবার বলি সাবাশ ব্রাদার তোমার বুদ্ধি। তাই করা হোক।

## ॥ কুড়ি ॥

তাই হল। প্ল্যান মাফিক কাজ করবে বলে প্রস্তুত হল সবাই।

সারাটা দিনভর ওরা সবাই সোৎসাহে তোড়জোড়ে লেগে গেল।

সন্ধ্যা হতেই অতি সন্তর্পণে গর্ত খুঁড়লো। আর অমনি প্রথমে বেরুলো খানিকটা উষ্ণ ধোঁয়া—চোখের পলকে ওরা কজন সেখান থেকে লাফিয়ে সরে না এলে সেই ভয়ানক উষ্ণ ধোঁয়ায় ঝলসে যেত সবার সর্বশরীর।

তারপর সেই জ্বালামুখ থেকে বের হতে লাগলো টগবগ করা ফুটন্ত লাভা এবং সঙ্গে সোনার মত গলিত আগুন।

তুবড়ির মত ক্রমশ উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে প্রায় তিনতলা সমান উঁচু হল। আর সেগুলো পড়তে লাগলো তিনশ ফুট নীচে বসে থাকা জংলী জনতার দিকে।

ভয়ংকর একটা গণ্ডগোল ও চেঁচামেচি হৈহুল্লোড় শোনা যেতে লাগলো নিচের মাউরীদের দিক থেকে।

অন্ধকার রাত্তিরের আকাশ ও আশে পাশের অনেকটা স্থান অগ্নুৎপাতের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো।

সেই আলোতে দেখা গেল—জংলী নরখাদকেরা যে যেদিকে পারে চোঁ-চাঁ দৌড় দিচ্ছে।

ভীতি বিহ্বল হাহাকার ধ্বনিও যেমন শোনা গেল, আবার একটা আনন্দ উল্লাসের আওয়াজও উঠলো সেই জংলী জনতার মধ্য থেকে। উল্লাস এই জন্যে যে ওরা ভেবে নিল শ্বেত দুশমনরা টেবু অমান্যের পাপে এবার জীবন্ত দগ্ধ হবে।

এদিকে ওরা শ্বেতাঙ্গরা সমাধি মন্দিরে সদ্য গড়া পাথরের পাঁচীলের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল।

নিস্তব্ধ নিঃসীম অন্ধকার রাতকে সচকিত করে এইভাবে ভয়াবহ গর্জনে অগ্ন্যুৎপাত হতে লাগলো।

সময় বয়ে যেতে লাগলো পলে পলে।

শেষরাত্রি নাগাদ শ্বেতাঙ্গ দল নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো যাবতীয় জংলীরা সব ভোঁ ভাঁ হয়ে গেছে।

একটি জনপ্রাণীকেও আর সেখানে দেখা যাচ্ছে না।

এই সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ। শ্বেতাঙ্গ দল আস্তে আস্তে তল্পিতল্পা নিয়ে পর্বতের পেছনের একটা চোরা-পথ দিয়ে নিচে নামতে লাগলো।

আগুনের আলোয় ভাগ্যিস পথটা আলোকিত ছিল, নয়ত পথ চলাই অসম্ভব হত।

বহুকষ্টে এক সময় ওরা সমতল ভূমিতে নেমে এল।

আবার যাত্রা হল শুরু।

আরম্ভ হল সুকঠিন দুর্গম গহন বনের পথ চলা। এ চলার যেন বিরাম নেই।

অথচ উপায় নেই। চলতেই হবে। প্রাণ বাঁচানোর এমনি তাগিদ।

সারারাত্রি এইভাবে দ্রুতবেগে হেঁটে ওরা প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করে গেল।

এ পথের পথ প্রদর্শক হল প্যাগানেল।

মানচিত্র দেখে সেদলকে ক্রমশ সমুদ্র তীরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন।

সমুদ্র পেলে, সমুদ্রতীর ধরে পথ চলা বেশ সুগম হবে।

বনজঙ্গল পাহাড় পর্বতে দিক নিশানা করা বড়ই দুষ্কর।

পথও কম নয়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে হবে ওদের।

এ পথ চলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে গেলে তা বিরক্তিকর হতে পারে।

তাই সংক্ষেপে বলা যায় যে শ্বেতাঙ্গ দলটি কয়েক দিনের মধ্যেই প্রায় নির্বিঘ্নে এক সময় অপার নীল সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস বওয়া তীরে পৌঁছে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

পথ এখন সোজা সরল হয়ে এসেছে। এবার বালুবেলা ধরে সোজা ইংরেজদের ঘাঁটি অর্থাৎ অকল্যাণ্ডের দিকে যেতে হবে।

সেখানে পৌঁছলেই নিশ্চিন্তি। অন্তত মনে করা যাবে এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে যাওয়া গেল। এবারকার মত ঝড়ঝঞ্ঝার হাত থেকে বুঝি রেহাই পাওয়া গেল।

কিন্তু হায়, নিয়তির লিখন বুঝি অন্য রকম ছিল।

অর্থাৎ কপালে ঝঞ্ঝাট থাকলে এড়ায় কার সাধ্যি।

সমুদ্রতীর ধরে ওরা বেশ নিশ্চিন্ত মনেই অকল্যাণ্ড অভিমুখে এগিয়ে চলেছে।

এমন সময় পিলে চমকানো এক দৃশ্য নজরে পড়লো শ্বেতাঙ্গদের।

সহসা নজরে পড়লো কতগুলি জংলীমাউরী জঙ্গলের দিক থেকে হাতে কুঠার প্রভৃতি অস্ত্রাদি নিয়ে ওদের আক্রমণ করতে ছুটে আসছে।

ভূত দেখার মত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রথমটা সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল।

এখন উপায়?

এরই মধ্যে অকস্মাৎ উইলসন চীৎকার করে বলে উঠে, ঐ তো কতগুলো নৌকো দেখা যাচ্ছে সমুদ্র তীরে। শিগ্‌গির, শিগ্‌গির ছুটে চলুন ঐ দিকে সবাই।

আশ্চর্য তো! কয়েকখানা নৌকো সমুদ্রের পাড়ে লাগানো ছিল।

কালবিলম্ব না করে তীরবেগে ছুটে গিয়ে, ওরই একটা নৌকোয় সবাই উঠে দ্রুতবেগে ধাক্কা দিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল।

চার পাঁচজনে মিলে প্রবলবেগে দাঁড় ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা সমুদ্রের ভেতরে অনেকটা এগিয়ে গেল।

ভয়ে আতংকে সকলেরই সর্ব শরীর কাঁপছে। শরীর আর বইছে না। মানুষের শরীরে আর কত সয়। একের পর এক ঝামেলায় মাথা খারাপ হয়ে যাবার দাখিল।

এদিকে বিপদ বাড়লো বই কমলো না। সেই জংলীরাও বাদবাকি নৌকোয় উঠে, দাঁড় টেনে ত্বড়িৎ গতিতে ওদের দিকে তাড়া করে আসতে লাগলো।

—জোরে দাঁড় চালাও। আরও জোরে, লর্ড চেঁচিয়ে আদেশ দিতে লাগলেন, ওদের নাগালের বাইরে থাকতেই হবে। নয়ত প্রাণ যাবে।

চলতে লাগলো নৌকো। এ যেন নৌকো বাইচ হচ্ছে। সর্বশক্তি উজাড় করে প্রত্যেকে দাঁড় টানতে লাগলো। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ চালানো সম্ভব।

শক্তিরও একটা সীমা আছে।

তাছাড়া একটা ছোট্ট নৌকো নিয়ে অতল সমুদ্রের মধ্যে কত দূরেই বা যাওয়া যাবে। সেখানেও ঝড়ে-জলে ঢেউ-এর আঘাতে নৌকো উলটে জলে ডুবে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

জংলীদের গতি ওদের চেয়ে বেশী।

জংলীরা ক্রমশ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। কিছু কাছে আসতেই মাউরীরা বন্দুক বাগিয়ে ওদের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগলো।

রেঞ্জের বাইরে থাকায় অর্থাৎ দূরত্বের জন্য সেগুলি ওদের গায়ে লাগলো না বটে কিন্তু দূরত্ব তো ক্রমেই কমে আসছে। তখন?

একেই বুঝি বলা হয় শিয়রে শমন।

এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত জিনিস চোখে পড়লো।

জাহাজ!

কে যেন চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ঐ ভাখো একটা জাহাজ!

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সমুদ্রের গভীরের দিকে চেয়ে দেখলো সত্যিই একটা জাহাজ ওদের নৌকোর দিকেই এগিয়ে আসছে।

—বন্ধুগণ জোরে, আরও জোরে চালাও, লর্ড গ্লেনারভ্যান সানন্দে চেঁচিয়ে ওঠেন ঐ জাহাজের কাছে যাওয়া চাই, ঐ জাহাজকে ধরা চাই-ই।

পেছনে জংলীদের নৌকো উল্কাবেগে এগিয়ে আসছে।

উভয় সংকট।

জাহাজটা যদি আবার বোম্বেটে অধিকৃত ওদেরই সেই 'ডানকান' হয়ে থাকে, তাহলে তো সমূলে বিনশ্যতি।

বোম্বেটেরা ওদের পেলে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে ফেলবে।

এদিকে জংলীরা ধরলেও একই পরিণতি একই দশা।

যা থাকে বরাতে।

নিশ্চিত মৃত্যুর থেকে অনিশ্চিত মৃত্যুর হাতে পড়া ঢের ভাল।

—ভাইসব প্রাণপণে দাঁড় চালাও। আরো জোরে আরও আরও জোরে……

এমন সময় আরেক কাণ্ড ঘটলো।

জাহাজ থেকে বিরাট গর্জনে দুম দুম দুম শব্দে কামান দাগা হল কয়েকবার।

দেখা গেল চোখের পলকে সে গোলাগুলো গিয়ে আঘাত করেছে জংলীদের দ্রুত এগিয়ে আসা নৌকোগুলোকে।

আর সেই মোক্ষম আঘাতে ঐ নৌকোগুলো ডুবে গেল, উলটে গেল।

কিছু জংলী তাতে মারা পড়লো। আর যারা প্রাণে বেঁচে গেল তারা পড়িমরি করে সাঁতরে পাড়ের দিকে পালাতে লাগলো।

কি অদ্ভূত ঘটনা।

বোম্বেটেদের এত দয়া। সেই চরম বিপদের মুহূর্তেও সবাই বিস্মিত না হয়ে পারল না।

## ॥ একুশ ॥

এরপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাহাজটা কাছে এসে গেল।

আরে! এ যে চেনা জাহাজ! এ যে নিজেদেরই জাহাজ। এক দৃষ্টিপাতেই সবার চিনতে অসুবিধে হল না এটা তাদেরই এককালের হারানো 'ডানকান' জাহাজ।

কিন্তু ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে ওটা কে? সেকেণ্ড অফিসার টম, নয়? আরে তাই তো, টমই তো।

যাই হোক বিস্মিত হবার সময় নয় তখন। জাহাজ কাছে এগিয়ে এল এবং সিঁড়ি নামিয়ে ওদের নৌকো থেকে ডেক-এ তুলে নিল।

কিন্তু কই, বোম্বেটেরা কই? তাদের তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এ যে সবই লর্ড গ্লেনারভ্যানের নিজের নাবিক! এবং তাঁর সহকারী অফিসার টমই তো পরিচালনা করছে এ জাহাজ!

—আমি তো এর কোন মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনা টম, বিহ্বল লর্ড প্রশ্ন করেন, কি ব্যাপার খুলে বলতো বৎস?

—সবই বলব লর্ড, টম স্মিতহাস্যে জবাব দেয়, এখন চলুন খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নেবেন। আপনারা ভীষণ ক্লান্ত। চলুন।

পুতুলের মত অবশ পদক্ষেপে সবাই এগিয়ে চললো।

* * * *

খাওয়া দাওয়া বিশ্রামের পর লর্ড পুনরায় প্রশ্ন করেন টমকে, কয়েদীরা কোথায় টম? তাদের তুমি কি করলে বলতো!

—কয়েদী! টম খুব অবাক হয়ে বলে, কয়েদী আসবে কোত্থেকে? কি বলছেন লর্ড?

—কেন, বোম্বেটে কয়েদীরা এ জাহাজ দখল করেনি?

—না তো! করলে তো আপনি দেখতেই পেতেন।

আশ্চর্য কাণ্ড তো, লর্ড এ কথার আগাপাশতলা কিছুই যেন বুঝতে পারছেন না, তা যেন হল। কিন্তু তুমি নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলেই বা করছিলে কি?

—আপনারই আদেশে আমি এখানে ঘোরা-ফেরা করছিলাম, আপনিই তো পত্র লিখে এ আদেশ দিয়েছিলেন আমায়।

—আমার সে পত্র তাহলে তুমি পেয়েছিলে বল! কিন্তু তাতে তো লেখা ছিল অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে ঘোরা-ফেরা করবার জন্যে!

—অষ্ট্রেলিয়ার উপকূল নয়তো, টম অবাক হয় বলে, তাতে লেখা ছিল নিউজিল্যাণ্ড।

—নিউজিল্যাণ্ড!! বলো কি। কে তোমায় পত্রটা দিয়েছিল বলতো? জেম জয়েস নামে জনৈক কয়েদী-দস্যুদের সর্দার তো?

—না। টম ও কম অবাক হয় না বলে, পত্র তো এনেছিল 'ব্রিটেনিয়া' জাহাজের কোয়ার্টার মাস্টার আইরটন।

—আইরটন! বল কি! সে কোথায়?

—তাকে বন্দী কবে রেখেছি এ জাহাজেই। এখুনি নিয়ে আসছি তাকে। ততক্ষণে পত্রটা দেখুন, বলে টম পত্রটা লর্ডের হাতে দিল।

সত্যিই তাই! লর্ড গ্লেনারভ্যানের জবানীতে প্যাগানেল-এর হাতের লেখায় লেখা রয়েছে ঃ

টম, তুমি অবিলম্বে নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলে ঘোরা ফেরা করতে থাকবে—ইতি লর্ড গ্লেনারভ্যান।

দেখে সবাই বিস্ময়ে থ' মেরে গেল।

এঁও সম্ভব। আশ্চর্য তো!

লর্ড জবানীতে বলেছিলেন 'অষ্ট্রেলিয়া' কিন্তু প্যাগানেল ভুল করে সেটাই 'নিউজিল্যাণ্ড' লিখে দিয়েছিল।

লজ্জায় প্যাগানেল যেন মরে গেল।

কিন্তু সবাই তাকে আন্তরিক ধন্যবাদই জানালো তার এই

অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে। এ বড় মধুর ভুল। এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। এতো শাপে বরং বরই হয়েছে।

যদি প্যাগানেল এ ভুল না করত তাহলে তো এই জাহাজকে আজ ওরা পেতনা। জাহাজ এখানে থাকতও না। ফলে তাদের ঐ জংলীদের কবলে পড়ে মৃত্যু বরণ করতে হত।

উপরন্তু এ জাহাজটি বোম্বেটে দস্যুদের হাতে গিয়ে পড়ত।

টমের কাছে শোনা গেল যে আইরটন তার হাতে উক্ত পত্রটি দিতেই সে যথা আজ্ঞা মাফিক জাহাজকে নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলের দিকে চালনা করে।

এ ঘটনায় প্রথমে বিস্মিত হয় আইরটন।

কেননা সে জানে পত্রে লেখা আছে' অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে ঘোরা ফেরার কথা—অথচ জাহাজ চলেছে নিউজিল্যাণ্ডের দিকে।

প্রথমে সে প্রতিবাদ করে ওঠে।

অবশেষে ঝগড়া—শেষ পর্যন্ত সে নাবিকদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়াবার চেষ্টা শুরু করে।

তখনই টম-এর সন্দেহ জাগে। তবে তো এ লোকটা বন্ধু নয়···

তৎক্ষণাৎ কালক্ষেপ না করে আইরটনকে সে বন্দী করে রাখে।

শুনে সবাই কম বিস্মিত হল না।

ঘটনার কি বিচিত্র গতি।

কি ভাবে অনিচ্ছাকৃত একটা লেখার ভুলে সকলের প্রাণ আশ্চর্য রকমে বেঁচে গেল। আর মহামূল্য জাহাজখানাও বোম্বেটেদের হাত থেকে বেঁচে গেল। সবই নিয়তির অমোঘ বিধানে ঘটে গেল।

আইরটনের সকল প্রকার দুষ্ট চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে।

এখন দেখা যাক আইরটন আর জেম জয়েস একই ব্যক্তি কিনা।

* * * *

টম ইতিমধ্যে নিচেকার কেবিন থেকে বন্দী আইরটনকে নিয়ে এসে হাজির করল শ্বেতাঙ্গ দলের কাছে।

লর্ড গ্লেনারভ্যান তার দিকে তাকিয়ে মৃদুহাস্যে বলে উঠলেন, আবার আমাদের এ জাহাজেই দেখা হল কি বল আইরটন।

আইরটন এর কোন জবাব দিল না।

—এ জাহাজকেই তো তুমি তোমার দলের দস্যুদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলে; কি বল? কথা বল? উত্তর দিচ্ছ না কেন?

আইরটন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

—চুপ করে থেকো না। একটা যা হোক বাণী দাও। কি তোমার বলবার আছে বল?

এবার মাথা তুলে লর্ডের দিকে তাকিয়ে অকম্পিত কণ্ঠেই আইরটন বললে, আমার কিছু আর বলবার নেই লর্ড।

—এখন আমি বুঝতে পারছি, লর্ড গম্ভীর হয়ে বললেন, সবই তোমার ছলনা, তোমার ঘৃণ্য চক্রান্ত।

তারপর লর্ড প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, এবার তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। সরাসরি জবাব দাও। যাকগে সকলে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট সম্বন্ধে কি জান বলো। কোন কথা গোপন করবেনা, সত্যি কথা খুলে বল?

—আমি কিছু জানি না।

—কিছুই জান না?

—না।

অনেক ভাবে চেষ্টা করা হল, অনেক জেরা করা হল কিন্তু আইরটনের মুখ দিয়ে কোন কথাই বার করা গেল না।

যে কথাই জিগ্যেস করা যায় শুধু বলে, জানি না।

ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের বিষয়ে অনেক কিছুই জানবার চেষ্টা করলেন লর্ড। কিন্তু কোন কথাই একগুঁয়ে লোকটার মুখ থেকে বার করা গেল না।

জন ম্যাঙ্গলস বিরক্ত হয়ে বললো, আইরটন তুমি ভুলে যাচ্ছ যে

এখন তুমি আমাদের হাতের মুঠোয়, যা জানো বল। নয়ত বিপদ হবে।

আইরটনের সেই একই উত্তর, আমাকে মেরে ফেলুন, কেটে ফেলুন, তবু আমি বলবো আমি কিছু জানি না।

বিরক্ত হয়ে তাকে পুনরায় কেবিনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আইরটন তার মুখ তখনও খুলল না।

## ॥ বাইশ ॥

অনেক কিছুই বুঝি বরাতে লেখা ছিল এই শ্বেতাঙ্গ দলের। সবই একে একে হল।

আর কেন, এবার দেশে ফেরা যাক।

যা বোঝা গেল তাতে মনে হয় ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট নিশ্চয়ই বেঁচে নেই আর।

জাহাজ চলতে লাগলো।

এক হিসেবে সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছে। স্বস্তি নেমেছে মনে। মনে হয় বাধা বিঘ্ন বোধ করি শেষ হয়েছে।

হারানো জাহাজকে ফিরে পাওয়াই তার একটা বড় শুভ ইঙ্গিত।

তবু সবার মন ক্যাপ্টেনের জন্যে সর্বক্ষণ খচখচ করতে থাকে।

আইরটনটাও এমন বদলোক যে এক বর্ণ কথাও তার কাছ থেকে বের করা গেল না।

অথচ একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে সে কিছুই জানে না। অবশ্যই সে সব কিছু জানে।

আরও দু'একবার লর্ড জেরা করে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ফল যথাপূর্বম। একটি কথা বার করা গেল না লোকটার মুখ থেকে।

লেডি হেলেন এবার এক প্রস্তাব করলেন, বললেন, পুরুষরা যখন হার মানলো, এবার না হয় মেয়েরা মানে আমি আর মেরী দুজনে মিলে চেষ্টা করে দেখি ওর কাছ থেকে কোন কথা বার করা যায় কিনা।

দুটি মেয়েতে মিলে আইরটন যে কেবিনে বন্দী আছে সেখানে গেল।

তারপর, ঠাণ্ডা শান্ত মিষ্টি কথায় ও ব্যবহারে প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে নানাভাবে চেষ্টা চালালো লেডি হেলেনা ও মেরী—কিন্তু উঁহুঁ—কিছুই বার করা সম্ভব হল না। আইরটনের সেই ইস্পাত কঠিন নীরবতা।

অন্যান্য আজেবাজে বিষয়, আর পাঁচজনের সম্বন্ধে নানা কথাই কইল সে, শুধু মাত্র কইল না কাজের প্রসঙ্গ, আসল প্রসঙ্গ।

মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে মেয়ে দুটি ফিরে এল কেবিন থেকে।

জাহাজ চলতে লাগলো নীল সাগরের বুক চিরে শোঁ শোঁ গতিতে।

এভাবে রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত, যায় আর আসে।

মেয়েরা অবশ্য হাল ছাড়ল না।

সুযোগ বুঝে আরেকদিন এক সময় গেল দুজনে মিলে।

আর আশ্চর্য, ঘণ্টা দুই বাদে সত্যি সত্যি হাসি মুখে বেরিয়ে এল ওরা।

উল্লসিত হয়ে লর্ডকে গিয়ে জানালে, সুসংবাদ আছে।

—কি রকম ?

—আইরটন বলতে রাজি হয়েছে। তবে একটিমাত্র শর্ত তার, যা বলবার সেটা শুধুমাত্র আপনাকেই বলবে। সব কিছুই বলবে।

কিছুটা আশার সঞ্চার হল মনে। তবু না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

দ্বিধা নিয়েই লর্ড নেমে গেলেন কেবিনে। এবং আইরটনকে নিয়ে নিভৃতে বসলেন।

—এবার বল তুমি কি জানো। কি তোমার বলবার আছে অকপটে সব খুলে বল আমায়।

—বলছি, আইরটন জবাব দেয়, তার আগে আমায় একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে লর্ড।

—প্রতিশ্রুতি ? কিসের প্রতিশ্রুতি ?'

—ইংল্যাণ্ডে আমাকে নিয়ে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দিতে পারবেন না, আইরটন বলে ওঠে, আর আমাকে যে কোন একটা নির্জন দ্বীপে নামিয়ে দিতে হবে। এইটেই আমার দ্বিতীয় অনুরোধ।

প্রথমে এ কথায় লর্ড কিছুতেই রাজি ছিলেন না। না না এটি অন্যায় কথা, অন্যায় আবদার। লর্ড খুবই ধর্মভীরু মানুষ। অপরাধীকে বিনা বিচারে, বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দিতে তাঁর বিবেকে বাঁধছে। বললেন, তা হয় না আইরটন। শাস্তি তুমি এড়াতে পারবে না।

—তাহলে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি লর্ড আইরটনের স্বর যেন সহসা কঠোর হয়ে উঠল; আমিও একটি কথাও বলব না। উহুঁ আমার কাছ থেকে কোন কথা আপনারা পাবেন না।

অসীম ক্রোধে দপ করে জ্বলে উঠলো লর্ডের চোখ। কিন্তু বহু কষ্টে সেভাব সামলে নিলেন। সামলে না নিলে চলবে না। কেননা ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের সংবাদটা-ই এখন তার পক্ষে বিশেষ জরুরী সংবাদ।

—বেশ আইরটন, নিরুপায় লর্ড প্রতিশ্রুতি দিলেন, তোমার ইচ্ছাই পূরণ করা হবে, কথা দিলাম, তবে বারেক ভেবে দেখ কোন নির্জন দ্বীপে নেমে থাকাও তো তোমার পক্ষে মরণেরই সামিল হবে। তাতেও তো তুমি কম শাস্তি পাবে না।

—তা হোক, আইরটনের সেই এক বুলি, আমায় যে কোন নির্জন দ্বীপে নামিয়ে দিতে হবে।

—বেশ, তাই হবে, লর্ড বললেন।

—তাহলে সাক্ষী ডাকুন।

অতএব প্যাগানেল, জন ম্যাঙ্গলস ও মেজরকে ডাকা হল কেবিনে সাক্ষী হিসেবে।

তাদের সামনে স্থির হল আইরটনের ইচ্ছানুসারে তাকে যে কোন একটা নির্জন দ্বীপে সময়মত নামিয়ে দেওয়া হবে। দ্বীপান্তর নির্বাসনের মত।

অতঃপর আইরটন মুখ খুললো। বলে গেল তার কাহিনী।

ব্রিটেনিয়া জাহাজের কোয়াটার মাস্টার হয়ে আসে সে অস্ট্রেলিয়ায়। কি একটা বিশেষ কারণে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের সঙ্গে তার মতানৈক্য হয়। সেটা গিয়ে দাঁড়ায় তুমুল ঝগড়াতে।

ফলে সে একসময় বিদ্রোহ করে এবং আরও কয়েক জন নাবিককে তার দলে টানবার চেষ্টা করে।

কিন্তু ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট অত্যন্ত কড়া লোক। তিনি ওকে আর দ্বিতীয় সুযোগ দিলেন না। কালবিলম্ব না করে টুফোণ্ড-বে'র কাছাকাছি ওকে একাকী নামিয়ে দিয়ে জাহাজ ছেড়ে চলে গেলেন তিনি।

—সেকি! তুমি না বলেছিলে যে ব্রিটেনিয়া জাহাজ ডুবির পর কোনক্রমে সাঁতরে এসে পাড়ে উঠেছিলে, সবিস্ময়ে জিগ্যেস করেন লর্ড।

—মিথ্যে কথা বলেছিলাম লর্ড, অকপটে আইরটন জানালো, আপনাদের বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে ওরকম কল্পিত কাহিনী বলতে হয়েছিল।

যাই হোক, এদিকে তখন তীরে নেমে আইরটনের হল ভীষণ অবস্থা।

এদেশ তার বিদেশ।

না চেনে রাস্তাঘাট, না আছে এখানে পরিচিত কেউ।

দুদিন অর্ধাহারে অনাহারে হাঁটাহাঁটির পর একদল জেল-পালানো কয়েদীদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়।

সেই কয়েদীরা ঐ অঞ্চলে ডাকাতি, রাহাজানি ও নরহত্যা করে ফিরছিল সে সময়টা।

তাদের দলে সেও ভীড়ে যায়।

তারপর কালক্রমে তাদের সর্দার বনে গিয়ে পুরোদমে ডাকাতি-রাহাজানি আরম্ভ করে।

ঐ সময় সে ছদ্মনাম গ্রহণ করে ঃ  জেমস জয়েস।

লর্ড সদলবলে যে ফার্মে উঠেছিলেন, একদা সেও ঘুরতে ঘুরতে সেখানে গিয়ে ওঠে।

আইরটন অবশ্য অকপটেই স্বীকার করল যে লর্ডের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই তার মনে বদ মতলবের জন্ম হয়েছিল।  বদ মতলব জেগেছিল।

সে সময় কিছুদিন যাবতই সে একটি জাহাজ করায়ত্ব করবার ফিকিরে ছিল।

জাহাজ একটা পেলে সে অনায়াসে তার দলবল নিয়ে বেশ ভালভাবে বোম্বেটেগিরি করে মহানন্দে দিন কাটাতে পারবে। জাহাজ পেলে ডাকাতির সীমাও প্রভূত বিস্তৃত হয়।  তাহলে জলে-স্থলে সর্বময় দস্যু সর্দার হওয়ার লোভনীয় বাসনা তার পূরণ হয়।

তাই, লর্ড গ্লেনারভ্যানের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র সে তাঁর 'ডানকান' জাহাজটাকে হাতড়াবার মতলব আঁটে।

এই কুমতলব মনে নিয়ে, সে লর্ড ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টের সম্ভাব্য জাহাজ ডুবির কাল্পনিক স্থান দেখাবার অছিলায় বনপথে সে দূরে নিয়ে যায়।

ঘোর জঙ্গলের মধ্যে বিষ প্রয়োগ করে সে নিজেই ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেলে।

এবং পূর্ব নির্দিষ্টকৃত চক্রান্ত অনুযায়ী সে লর্ডের দ্বারা 'ডানকানের' সহকারী ক্যাপ্টেনের নিকট এক পত্র লিখিয়ে নেয়।

তারপর সে পত্র নিয়ে নিজেই কার্য সিদ্ধি করতে রওনা হয়।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস।

প্যাগানেলের সামান্য ভুলের জন্য তার সমস্ত কিছু পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

আইরটন তার কাহিনী শেষ করে বললে, তারপরের ঘটনা তো আপনি লর্ড সবই জানেন।

—কিন্তু ক্যাপ্টেন গ্র্যাণ্টের কথা তো কিছু বললে না, লর্ডের প্রশ্ন, ক্যাপ্টেনের কি সংবাদ জানো তাই বলো ?

—আর তো কোন খবর আমি জানি না লর্ড, আইরটন বললে, তবে যদ্দূর মনে হয় তিনি ক্যালাও বন্দর থেকে পাড়ি দিয়ে নিউজিল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন এবং খুব সম্ভব তখনই পথে জাহাজডুবি হয়ে বিপর্যয় ঘটে। অবশ্য সবই আমার অনুমান মাত্র।

শুনে সবাই অতিশয় হতাশ হল। লোকটার কাছ থেকে তো কোন নতুন সংবাদই পাওয়া গেল না।

জাহাজ চলতে লাগলো।

এখন কাজ বাকি রইল, একটা নির্জন দ্বীপ খুঁজে বের করে আইরটনকে সেখানে নামিয়ে দেওয়া। দ্বীপান্তরের নির্বাসন দণ্ড। আসামীর নিজ ইচ্ছানুযায়ী নির্জনবাস।

নীল সমুদ্রের বুক কেটে সাদা ফেনায় চারদিক আলোড়িত করে জাহাজ চলতে লাগল।

## ॥ তেইশ ॥

ভৌগোলিক প্যাগানেল এবার মানচিত্র দেখতে লাগলো এ অঞ্চলের সমুদ্রের।

—এই তো একটি অতি নির্জন ছোট্ট দ্বীপ পাওয়া গিয়েছে, প্যাগানেল জানায়, ঐ দ্বীপটার নাম হল, 'মেরিয়া থেরেসা।'

এটার মত নির্জন নিরালা দ্বীপ বোধ করি প্রশান্ত মহাসাগরে আর দ্বিতীয়টি নেই।

মানচিত্রের মধ্যে যেটাকে দেখাচ্ছে একটা বিন্দু সদৃশ আসলে সেটি হচ্ছে মাইল পাঁচেক লম্বা ও মাইল তুই চওড়া একটি ভূখণ্ড।

আমেরিকা থেকে এই মেরিয়া থেরেসা দ্বীপের দূরত্ব সাড়ে তিনহাজার মাইল এবং নিউজিল্যাণ্ড থেকে দূবত্ব দেড় হাজার মাইল।

এ দ্বীপে কোন জাহাজ আসে না। সৃষ্টির আগে থেকে আজ পর্যন্ত এ ভূখণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই। ভবিষ্যতের হবার আশংকা কম।

অতএব 'ডানকান' জাহাজ সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ 'মেরিয়া থেরেসায়' এগিয়ে চলল।

...প্রায় তুদিন বাদে দিক চক্রবালে উক্ত দ্বীপটি দৃষ্টি গোচর হল।

দেখা গেলেও, ওটা এখনও প্রায় তিরিশ মাইল দূরে রয়েছে।

জাহাজ যত অগ্রসর হতে লাগলো দ্বীপটা ক্রমশ ততই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগলো।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ জন ম্যাঙ্গলসের নজবে পড়লো দ্বীপটা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

ব্যাপার কি?

—বোধ কবি এটা একটা আগ্নেয় দ্বীপ।

—অসম্ভব নয় সেটা।

জাহাজ এগোতে এগোতেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তখনো দ্বীপটা বেশ কয়েক মাইল দূরে ছিল।

লর্ড জিগ্যেস করেন, বেশ রাত্তিরের আগে তো ওখানে পৌঁছনো যাবে না কি বল ?

—উঁহু—তা যাবে না। তাছাড়া এরকম একটা অজানা অচেনা দ্বীপে রাত্তিরবেলা জাহাজ ভেড়ানোও উচিত বলে মনে করছি না লর্ড। টম বলে।

—সে কথা ঠিক, মাথা নেড়ে সায় দেন লর্ড।

অতএব রাত আটটা নাগাদ উপকূল থেকে আধ মাইল দূরে সমুদ্রের মধ্যে জাহাজকে নোঙর করে রাখা হল।

রাত কাটুক।

ভোরে না হয় আইরটনকে নামিয়ে দেওয়া যাবে।

রাতের বেলা অন্ধকারের মধ্যে প্রথমে দেখা গেল মেরিয়া থেরেসার মধ্যে এক জায়গায় একটা যেন আগুন জ্বলছে।

সবার সন্দেহ রইল না যে এটা অবশ্যই একটি আগ্নেয় দ্বীপ।

কিন্তু আগ্নেয়গিরি সুলভ কোন প্রকার গর্জনাদি শোনা যাচ্ছে না কেন ?

প্যাগানেল বিশ্লেষণ করে বললে, কতগুলো আগ্নেয়গিরিতে শুধুমাত্র আগুনই জ্বলে, কোন প্রকার শব্দ আওয়াজ আদৌ হয় না।

প্যাগানেলের এই ব্যাখ্যা কিন্তু খণ্ডিত হল পর মুহূর্তেই! মিথ্যে প্রমাণিত হল।

দেখা গেল ঐ দ্বীপে প্রথম আগুনের অদূরে আরেকটা আগুন জ্বলে উঠল। এবং আরও আশ্চর্যের কথা এই যে ঐ আগুনটা আবার নড়ে চড়ে বেড়াতে লাগলো এখানে ওখানে।

আবার সেটা একবার জ্বলছে একবার নিভছে। এ আবার কি আজব ব্যাপার!

—তাহলে তো এটা কখনোই আগ্নেয়গিরি নয়, লর্ড জোর গলায় বলে ওঠেন, এ দ্বীপে নিশ্চয়ই মানুষ আছে দেখছি।

—অসভ্য জংলীরা ছাড়া কে আর বাস করবে এখানে। প্যাগানেল মন্তব্য করলে।

—তা হোক। তবুও এখানেই আইরটনকে নামিয়ে দেওয়া হবে। কে যেন মন্তব্য করে ওঠে।

দ্বীপটা যখন জংলী-অধ্যুষিত বলে সন্দেহ হচ্ছে তখন সাবধানের মার নেই, জাহাজে পাহারা রাখা দরকার।

তাই ব্যবস্থা হল। রাত এগারটায় ডেকের ওপর জনৈক সতর্ক নাবিককে পাহারায় রেখে সবাই ঘুমতে গেল।

সবার চোখে ঘুম। ঘুম নেই শুধু মেরী আর রবার্টের চোখে। কি জানি কি ভাবছে ওরা। কি চিন্তা করে ওদের বায়ু চড়ে গেছে কে জানে।

ঘুম যখন আসছেনা, তখন শুধু শুধু বিছানায় শুয়ে থেকে লাভ কি।

এক সময় ওরা দুজনে এক সময় ডেক-এ উঠে এসে রেলিং ধরে দাঁড়ালো।

মাথার উপর উন্মুক্ত তারা ভরা আকাশ। নিচে কল্লোলিত প্রশান্ত মহাসাগর।

চমৎকার শীতল বাতাসে চতুর্দিক ব্যতিব্যস্ত বিপর্যস্ত। শোঁ। শোঁ। আওয়াজে প্রবল বাতাস মাতামাতি করছে।

দুজনে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করলো ভাই-বোনে।

মেরি রবার্টের ভবিষ্যতের কথা ভাবলো, রবার্ট মেরির ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করল। দুজনে মিলে আলোচনা করলো হারিয়ে যাওয়া বাবার কথা। ক্যাপ্টেন গ্র্যান্ট। বাবা কি এখনো বেঁচে আছেন? তাঁর সম্পর্কে তাঁর ফিরে আসা সম্পর্কে কি আর কোন আশা আছে?

সময় কাটতে লাগলো।

এমন সময় এক রোমহর্ষক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো।

অকস্মাৎ ওরা দুজনেই শুনতে পেল জাহাজের নিচে সমুদ্রজলের মধ্য থেকে একটি আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে ঃ

—বাঁচাও! বাঁচাও!!

কানখাড়া করে শুনলো দুজনে। তারপর রবার্ট সভয়ে বলে উঠল, শুনতে পাচ্ছ মেরী।

দুজনেই রেলিং ধরে ঝুঁকে জলের দিকে চাইল। কিন্তু গাঢ় অন্ধকার—কেবল ঢেউগুলো সামান্য চিক চিক করছে! আর কোন কিছু দেখা গেল না।

মেরী বলবার চেষ্টা করলো, জানিস রবার্ট, আমি ভাবলাম, আমি ভাবলাম……'

ওর কথা শেষ হবার পূর্বেই ফের ঐ আর্তকণ্ঠ শোনা গেল, বাঁচাও! বাঁচাও!

এবার দুই ভাই-বোন প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলো, বাবা! বাবা! এ যে বাবার গলা, বাবা!……

## ॥ চব্বিশ ॥

মেরী মুর্চ্ছিত হয়ে ঢলে পড়ল। তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে রবার্ট তাকে ধরে না ফেললে মেরী পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক জখম হয়ে যেত।

ওদের চিৎকার শুনে পাহারা রত নাবিকটি ছুটে এল ওদের কাছে।

কেবিন থেকে অপরাপর মানুষেরাও এসে জড় হল ডেক-এ।

কি ব্যাপার ? কি হয়েছে। ববার্ট ও মেরী সহসা বিকটভাবে চেঁচিয়ে উঠল কেন ? কারণ কি ?

রবার্ট ও মেরী নাকি সমুদ্রজলে জাহাজের গায়ে স্পষ্ট শুনেছে তাদের বাবার কণ্ঠ আর্তস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করছে বাঁচাও ! বাঁচাও !! বলে।

শুনে সবাই রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে অন্ধকারের মধ্যেই দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোথায় কে ? শুধু তরঙ্গমালা আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। আর কোন কিছুই নজরে পড়লো না। জনমনিষ্যি কোথায় ?

প্যাগানেল বললে, এরকম হয়। অতি চিন্তায় এরকম ভুল আওয়াজ শোনে। ওদের দুজনের সর্বক্ষণের চিন্তাই তো কেবল ওদের হারিয়ে যাওয়া বাবার কথা। তাই ওরা দুজনেই ও রকম একটা কাল্পনিক আর্তস্বর শুনেছে। ও কিছু নয়। অলীক কণ্ঠস্বর।

ভাই বোন উত্তেজনায় তখনও কাঁপছিল। মেরী তো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই শুরু করে দিয়েছে।

—বাবা, বাবাগো······

লর্ড গ্লেনারভ্যান দুটি অনাথ তরুণ তরুণীর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করবার প্রয়াস পেলেন।

আহা বেচারারা।

অবশেষে দুজনকে দুহাতে জড়িয়ে নিয়ে চলে এলেন নিচে কেবিনে। ওদের শোয়াবার ব্যবস্থা করবেন।

এক সময় রাত কেটে গিয়ে প্রভাতের আলোক রশ্মি পূব গগনে দেখা দিল।

সকালে সবাই পুনরায় ডেক-এ এসে উপস্থিত হল।

সবাই এই আজব ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে ভালভাবে দেখতে চায়।

অনেকে বাইনাকুলার দিয়ে ভূখণ্ডটিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

রবার্ট তীর ভূমির দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ চীৎকার করে বলে ওঠে, ঐ ঐ দেখুন দুজন মানুষ তীরে দাঁড়িয়ে নিশান হাতে নিয়ে নাড়াচ্ছে!

জন ম্যাঙ্গলস বাইনাকুলার ঘুরিয়ে সেই মূর্তিদ্বয়ের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে চীৎকার করে ওঠে, আরে! এ যে দেখছি আমাদের জাতীয় পতাকা! ইউনিয়ান জ্যাক!

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ। তাই তো হে, লর্ডও দেখে সায় দিলেন।

—লর্ড, আমি ঐ দ্বীপে এক্ষুণি যাব, রবার্ট যেন প্রায় ক্ষেপে গেল, আমায় যদি নৌকোয় না পাঠান তো আমি সাঁতরেই চলে যাব। আমি আপনাদের কাছে হাত জোড় করে মিনতি করছি আমায় নিয়ে চলুন ঐ দ্বীপে।

এরপর একটা সাময়িক স্তব্ধতা নেমে এল ডেক-এ কেউ আর কোন কথা উচ্চারণ করল না।

প্রত্যেকের মনেই কি জানি কেন গত রাত্রের কথাই ক্রমাগত পাক খেতে লাগলো!

তাহলে কি…?

দ্রুত একটা নৌকো নামিয়ে দেওয়া হল।

তাতে উঠে বসলো লর্ড গ্লেনারভ্যান, মেরী, রবার্ট, জন ম্যাঙ্গলস ও প্যাগানেল।

দাঁড় বাইবার জন্যে দুজন বলিষ্ঠ নাবিককে নেওয়া হল সঙ্গে।

জাহাজ ছেড়ে এক সময় নৌকো চললো ক্ষুদ্র দ্বীপ মেরিয়া থেরেসার উপকূল ভূমির উদ্দেশ্যে।

দ্বীপের তীর থেকে নৌকোটা যখন প্রায় তিরিশ চল্লিশ গজের মধ্যে এসে গিয়েছে, এমন সময় মেরী অকস্মাৎ আকাশ ফাটা চিৎকার করে উঠল, বাবা! ঐ যে বাবা!

তীরে একজন লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন, পাশে ছিল আরও দুজন লোক।

সত্যিই সেই বলিষ্ঠ মানুষটি মেরী আর ববার্টের বাবা, ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট।

আর আশ্চর্য, মেরীর কণ্ঠস্বর, মেয়ের বাবা। ডাক শুনে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট মুর্চ্ছিত হয়ে তখুনি বালুকাভূমির ওপর পড়ে গেলেন।

প্রাণপণে দাঁড় টেনে নৌকো একসময়ে তীরে গিয়ে ভীড়লো।

তার পরের দৃশ্য হর্ষ বিষাদের।

ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের জ্ঞান ফিরে এলে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে জাহাজে নিয়ে আসা হল।

ছেলে রবার্ট ও মেয়ে মেরীর মুখে আদ্যোপান্ত ইতিহাস সংক্ষেপে শুনে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট, লর্ড ও তাঁর সঙ্গীদের অজস্র ধন্যবাদ দিলেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

আইরটনকে দ্বীপটিতে নির্বাসন দেবার পূর্বে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট পুনরায় সকলকে মেরিয়া থেরেসা দেখাতে নিয়ে গেলেন।

ছোট্ট দ্বীপ। নিজেদের তৈরী কাঠের একটা কুটির দেখালেন।

সেখানে ওদের সকলকে বসিয়ে ক্যাপ্টেন ওদের সামান্য ফলমূল

এবং ভেড়ার দুধ আর ঝরণার মিষ্টি জল দিয়ে জলযোগ করিয়ে আপ্যায়িত করলেন।

ক্যাপ্টেন জানালেন, এ দ্বীপে মোটামুটি ভালই ছিলেন তাঁরা।

সেই কাঠের কুটিরে বসে ক্যাপ্টেন তাঁর কাহিনী বলে গেলেন।

এই মেরিয়া থেরেসার উপকূলেই তাঁর 'ব্রিটেনিয়া' জাহাজ-ডুবি হয়।

তৎপূর্বে তাঁরা সাত সাতটি ভয়াবহ দিন প্রচণ্ড তুফানের সঙ্গে জুঝেছেন।

প্রাণে বেঁচেছেন তাঁরা মাত্র তিন জন। বাদবাকি সবাই জাহাজ-ডুবিতে সলিল সমাধি হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। হায়! সেকথা স্মরণ করলেও চোখে জল আসে। যাই হোক।

তাঁরা তিনজন কোনমতে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র সাঁতরে এসে ওঠেন এই দ্বীপে।

ড্যানিয়েল ডেফোর, রবিনসন ক্রুশোর অবস্থা হল তাদের। এবং রবিনসন ক্রুশোকে আদর্শ রেখেই তাঁরা তিনজন কাজে লেগে গেলেন। প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত পরিশ্রম শুরু হল।

ভগ্ন ডুবন্ত 'ব্রিটেনিয়ার' কাঠ দিয়ে ঘর বানালেন।

শষ্য বুনলেন।

ভেড়া পুষলেন। নিকটবর্তী ঝরণা থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন।

স্বদেশে ফিরে যাবার সামান্যতম আশাও ছিল না তাদের।

অতএব যাবজ্জীবৎ এটাকেই ঘরবাড়ি ভেবে বাস করতে লাগলেন।

একমাত্র মৃত্যু ছাড়া এই দ্বীপ থেকে তাঁদের কেউ মুক্তি দিতে পারবে না এবিষয়ে তাঁরা প্রায় ধ্রুব নিশ্চিত ছিলেন।

আড়াই বছর এইভাবে একরকম সুখে দুঃখে কেটে যাচ্ছিল।

একমাত্র দুঃখ ছিল মানুষ জনের মুখ দেখা হত না। এছাড়া আর বিশেষ ক্ষোভ ছিল না মনে। প্রাণ শুধু কাঁদতো লোকজন দেখবার আকাঙ্ক্ষায়, দুঃসহ মনে হত এই তিনটি মাত্র প্রাণীর নির্জনতা।

উদ্ধারের কোন আশা নেই, পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। কেননা এ ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরের এমন নিরালা অংশে অবস্থিত যে এখান দিয়ে কোন জাহাজ যাতায়াত করে না। এটা জাহাজ চলাচলের পথও নয়। তবে যদি পথ ভুল করে কেউ এসে যায়, তাছাড়া কোন আশা ছিল না।

মাঝে মাঝে দু'একখানা পথভোলা জাহাজও যে না দেখা গেছে এমন নয়। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে তাঁরা আগুন জ্বেলেছেন, নিশান উড়িয়েছেন—কিন্তু হায়, সেই সব জাহাজের লোকেরা বোধ করি উক্ত নিশানা দেখতে পায়নি। যে যার নিজেদের পথে চলে গিয়েছে না থেমে।

অতঃপর পরিত্রাণ ও উদ্ধারের আশা ত্যাগ করেছিলেন ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট।

—অবশেষে, গতরাত্রে যখন তোমাদের জাহাজকে দেখলাম, ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট বলতে লাগলেন, মনে বড় আশার সঞ্চার হল। আগুন জ্বালালাম দু'দুবার। তবু তোমাদের দিক থেকে কোন আভাস ইঙ্গিত পেলাম না।

অবশেষে পাছে এবারেও জাহাজটাকে হারাই তাই মরিয়া হয়ে অন্ধকার রাত্রেই জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে গেলাম জাহাজের কাছে।

কিন্তু সূচীভেদ্য অন্ধকার আব উত্তাল ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজের খুব কাছাকাছি এগোতে পারলাম না।

দুবার জাহাজের নিকট থেকে, বাঁচাও! বাঁচাও! বলে চিৎকার করলাম।

কিন্তু বেশীক্ষণ ঐ উত্তাল ঢেউএর মধ্যে থাকা সম্ভব ছিল না। ফিরে এলাম তীরে, প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায়।

সমস্তরাত যে আমাদের কি যন্ত্রণায় কাটলো তা বলবার নয়।

সারারার্ত জেগে কাটালাম।

ভয় ছিল হয়ত কোন কারণে থেমেছে এ জাহাজ, ফের হয়ত রাতারাতি চলে যাবে ফিরে। তাহলে কি সর্বনাশ!

## ॥ পঁচিশ ॥

তারপর দুঃসহ এই রাত এক সময় পোহাল।

সকালে বিস্মিত হয়ে দেখি তোমাদের জাহাজ থেকে একটা নৌকো আসছে আমাদের দ্বীপে। তারপরের ঘটনা তোমাদের সব জানা।

—তবে, ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট বললেন, বড় আফশোসের কথা যে মেরিয়া থেরেসা অতি নগণ্য ক্ষুদ্র দ্বীপ। এটা যদি বড় হত, আর ঝরণার বদলে যদি এখানে থাকত একটা বড় নদী তাহলেই একে আমি আমার দেশের একটা উপনিবেশ করতে পারতাম।

লর্ড হেসে ফেললেন, বললেন, এখনো আপনার মাথা থেকে উপনিবেশিক চিন্তা যায়নি দেখছি।

তারপর সামান্যক্ষণ সবাই একটু ঘুরে ফিরে দ্বীপটাকে দেখে পুনরায় ফিরে এল জাহাজে।

এখন শেষ কাজ বাকি।

আইরটনকে আজই এই দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে দেশের পথে যাত্রা করতে হবে।

আর দেরী সইছে না কারুর। পালাই পালাই মন হয়েছে। কতক্ষণে দেশে ফিরবে, কতদিনে আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে, এই চিন্তাই তখন হয়ে উঠল প্রধান চিন্তা।

আইরটনকে ডেক-এ নিয়ে আসা হল।

ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট মৃদু হাস্য সহকারে তার দিকে তাকালেন, বললেন, আবার তাহলে আমাদের দেখা হল আইরটন, কি বল?

কিছু বললে না আইরটন প্রথমে। মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বুঝি মনে সাহস সঞ্চয় করে বললে, আপনাকে সুস্থশরীরে জীবন্ত দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত ক্যাপ্টেন।

—ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন বললেন, এবার থেকে ঐ নির্জন দ্বীপে বাস করতে হবে তোমায়। শুনলাম স্বইচ্ছায়ই নামছ। ভাল। আমৃত্যু অনুশোচনায় তোমার কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্য করতে থাকবে। ভাল।

লর্ড গ্লেনারভ্যান শেষ বারের মত বললেন, তাহলে এখনো তোমার এই মত যে তুমি এখানেই নামবে আইরটন?

—হ্যাঁ'

—এখনও ভেবে দেখ, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন জনমানবের মুখ তুমি দেখতে পাবে না। একা, ভয়াবহ একা তোমাকে কাল কাটাতে হবে। তুমি মরে থাকবে, কিন্তু কবর দেবার কেউ থাকবে না। তোমার মৃতদেহ পশুপাখী মিলে ঠুকরে ঠুকরে খাবে।

—তবু আমি এখানেই নামব, অদ্ভুত গোঁ আইরটনের।

—বেশ, তাহলে প্রস্তুত হও। যদিও তুমি মানুষের স্মরণযোগ্য আদৌ নয়, তবু লোকেরা তোমায় মনে রাখবে। অন্তত আমরা একয়জন তো তোমাকে এজন্মের মত মনে রাখতে বাধ্য থাকব। তাছাড়া তোমার ঠিকানাও আমাদে৷ জানা রইল। কখনো প্রয়োজন পড়লে তোমাকে অবশ্যই এখানে পাব, এটুকু সুবিধে রইল।

—ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন, অকম্পিত আশ্চর্য ঠাণ্ডা কণ্ঠে আইরটন বলে ওঠে।

এই শেষ কথা। এবং এখানেই কথাবার্তার শেষ।

নৌকো প্রস্তুত ছিল। কিছু মাংস কয়েকটা পোষাক এবং একটা আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে দেওয়া হল। একটি বাইবেল দিতেও ভুললেন না লর্ড।

বিদায়ের ক্ষণ এল।

লেডি হেলেনা ও মেরীর এই পাপিষ্ঠের জন্যেও চোখে জল এলো।

—এখনো ওকে ভেবে দেখতে বলুন, কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে ওরা দুজন লর্ডকে অনুরোধ করল, এখনও সংকল্প পালটাক নয়ত বেচারা শেষে হয়ত সাংঘাতিক অনুতাপ করেও কূল কিনারা পাবে না। আফশোসের সীমা থাকবে না।

—ওকে যেতে দাও হেলেনা, লর্ড গ্লেনারভ্যান বললেন ওর এ ধরণের শাস্তিই অবশ্য প্রাপ্য ছিল।

ওকে পৌঁছতে সঙ্গে গেল জন ম্যাঙ্গলস।

নৌকো ছেড়ে দিল। আইরটন খালি মাথায় জাহাজের দিকে পেছন ফিরে নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে রইল।

জাহাজে সবাই টুপী খুলে ফেললো। মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি শেষ সম্মান যেমন ভাবে দেখায়, তেমনি।

নৌকো এগিয়ে গেল 'মেরিয়া থেরেসা' দ্বীপের দিকে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। সকলেই যেন বোবা বনে গেছে। কঠিন নিস্তব্ধতা।

নৌকো দ্বীপে ভীড়তেই আইরটন লাফ দিয়ে তীরে নেমে গেল।

জন ম্যাঙ্গলস ও নাবিকরা নৌকো নিয়ে ফিরে এল জাহাজে।

বিকেল তখন চারটে।

ডেক-এর ওপর থেকে সবাই দেখতে পেল আইরটন একটা ছোট টিলার উপর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে জাহাজের দিকে তাকিয়ে।

লেডি হেলেনা ও মেরীর বুক চিরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। চোখ এল ভিজে। অস্ফুটে বারেক বললে শুধু, বেচারা।

—এবারে তাহলে আমার জাহাজ ছাড়ি লর্ড? জন ম্যাঙ্গলস অর্ডার প্রার্থনা করল।

—হ্যাঁ জন, লর্ডের দৃষ্টি তখন 'মেরিয়া থেরেসার' উপর নিবদ্ধ।

আইরটনের জন্যে দুঃখে হৃদয়খান লর্ডের বাক রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

—এবারে জাহাজ ছাড় টম্, জন ম্যাঙ্গলস আদেশ করল।

ধীরে ধীরে 'ডানকান' জাহাজ এই ক্ষুদ্র দ্বীপ থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো।

·

রাত আটটার মধ্যেই ক্ষুদ্র 'মেরিয়া থেরেসা' দ্বীপ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে এক সময় দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে গেল।

শেষ